আকাইদ ও ফিকহ

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মাওলানা রূহুল আমীন খান
ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২০
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্যে-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি মুসলমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'আকাইদ ও ফিকহ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায় বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হব।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : আল আকাইদ

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আকাইদ ও দীন	১	৫ম পাঠ	আশ শিরক বিল্লাহ	৩৫
১ম পাঠ	আকাইদের স্বরূপ	১	৩য় অধ্যায়	আল ইমান বিল মালায়েকা	৪০
২য় পাঠ	দীনের পরিচয় ও পরিসর	৫	৪র্থ অধ্যায়	আল ইমান বির রসুল	৪৫
২য় অধ্যায়	আল ইমান বিল্লাহ	১৩	৫ম অধ্যায়	আল ইমান বিল কুতুব	৬৩
১ম পাঠ	আত তাওহিদ ফিয্যাত	১৩	৬ষ্ঠ অধ্যায়	আল ইমান বিল আখেরাত	৭০
২য় পাঠ	আত তাওহিদ ফিস সিফাত	১৮	৭ম অধ্যায়	আল ইমান বিল কদর	৭৯
৩য় পাঠ	আত তাওহিদ ফিল হুকুক	২৩	৮ম অধ্যায়	ইলমুত তাযকিয়া ওয়াত তাসাউফ	৮৫
৪র্থ পাঠ	আত তাওহিদ ফিল ইবাদত	২৭			

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	ইলমে ফিকহের ইতিহাস	৯৩	৩য় পাঠ	সালাতুল মুসাফির	১৩২
১ম পাঠ	ইলমে ফিকহ	৯৩	৪র্থ পাঠ	সাহু সাজদা	১৩৬
২য় পাঠ	মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা	৯৪	৫ম পাঠ	নফল সালাত	১৩৯
৩য় পাঠ	হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য	৯৫	৪র্থ অধ্যায়	সাওম	১৪৪
৪র্থ পাঠ	প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমামের জীবনী	৯৬	১ম পাঠ	সাওমের মাসায়েল	১৪৪
২য় অধ্যায়	আত তাহারাত	১০৫	২য় পাঠ	ইতেকাফ ও সদাকাতুল ফিতর	১৫০
১ম পাঠ	গোসল	১০৫	৫ম অধ্যায়	যাকাত	১৫৬
২য় পাঠ	মোজার উপর মাসেহ	১১০	১ম পাঠ	যাকাতের আহকাম ও উপকারিতা	১৫৬
৩য় পাঠ	হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা	১১৫	২য় পাঠ	উশর	১৬৬
৩য় অধ্যায়	সালাত	১২০	৬ষ্ঠ অধ্যায়	যবেহ ও মানত	১৬৯
১ম পাঠ	সালাতুল জুমুআ	১২০	১ম পাঠ	যবেহ	১৬৯
২য় পাঠ	সালাতুল ইদাইন	১২৫	২য় পাঠ	মানত	১৭২

তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আখলাকু হাসানা	১৭৬	৪র্থ অধ্যায়	নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ	২০৮
১ম পাঠ	আখলাক পরিচিতি ও সর্বোত্তম আখলাক	১৭৬	১ম পাঠ	তাওবা ও অনুতাপ	২০৮
২য় পাঠ	উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি	১৮১	২য় পাঠ	আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি	২০৯
৩য় পাঠ	আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি	১৯০	৩য় পাঠ	তাসবিহ	২১১
২য় অধ্যায়	নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ	১৯৮	৫ম অধ্যায়	শবে বরাত, শবে কদর ও দুই ইদের রাতে নফল সালাত	২১১
১ম পাঠ	আত্মম্ভরিতা	১৯৮	১ম পাঠ	মাসনুন দোআসমূহ	২১৫
২য় পাঠ	প্রতারণা	১৯৯	২য় পাঠ	কুরআন মাজিদের আলোকে দোআর গুরুত্ব	২১৫
৩য় পাঠ	অপব্যয়-অপচয়	২০০	৩য় পাঠ	হাদিস শরিফের আলোকে দোআর আদব ও গুরুত্ব	২১৬
৩য় অধ্যায়	হালাল ও হারাম	২০৩	৪র্থ পাঠ	কয়েকটি মাসনুন দোআ	২১৬
১ম পাঠ	হালাল ও হারামের পরিচয়	২০৩			
২য় পাঠ	হারাম বস্তু ও হারাম আমল	২০৪			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ
আকাইদ
اَلْعَقَائِدُ

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ ও দীন
اَلْعَقَائِدُ وَالدِّيْنُ

প্রথম পাঠ
আকাইদের স্বরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيْبِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَاحِبِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَجَمِيْعِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ.

আকাইদের ধারণা ও গুরুত্ব

আকাইদ (عَقَائِدُ) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন, একবচনে আকিদা (عَقِيْدَةٌ)। এর অর্থ বন্ধনসমূহ, বিশ্বাসমালা। যে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে, তাকে আকিদা (عَقِيْدَةٌ) বলে।

বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ ছাড়া কোনো চিন্তা, দর্শন ও কর্ম যথার্থভাবে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আমলকে যদি দেহ ধরা হয়, আকিদা তার প্রাণ। দেহ যেভাবে প্রাণ ছাড়া অকার্যকর, তেমনি সহিহ আকিদা ছাড়া আমলও মূল্যহীন। তাই ইসলামি শরিয়তে আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করাকে ফরজ করা হয়েছে। এক আল্লাহকে মানার মাঝে, যে শান্তি নিহিত তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা, মন মানসিকতায় স্থির করাই আকিদার মূল চেতনা।

প্রিয় নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওপর ইমানের স্বরূপ, পরিসর, তাঁর শান ও মান, আনিত জীবনব্যবস্থা, ফেরেশতা, অন্যান্য নবি-রসুল, আসমানি গ্রন্থসমূহ ও আখেরাতসহ মানবজীবনের চলার

দর্শন ও দিকনির্দেশনা কী হবে; তাই নির্দেশ করে আকাইদ। সন্দেহাতীতভাবে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

হজরত যুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন-

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

অর্থ : আমাদের ভরপুর যৌবনে আমরা নবি করিম (ﷺ) এর সাথে কাটিয়েছি। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ইমানের (আকাইদ) শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এরপর কুরআন শেখার মাধ্যমে আমাদের ইমান আরও মজবুত হয়েছে। (সুনানু ইবনে মাযাহ, ৬১)

মুমিনের জীবনে সহিহ আকিদার প্রয়োজনীয়তা

মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুদৃঢ় ইমান ও সহিহ্ আকিদা। আকিদা খারাপ হলে আমল যত ভালোই হোক না কেন তা নিষ্ফল। কুরআন মাজিদে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন অর্জন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً.

অর্থ : যে কোনো নারী পুরুষ ইমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করবে, অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র (উন্নত সমৃদ্ধ) জীবন দান করব। (সুরা নাহল, ৯৭)

এ আয়াতে নেক আমল করার জন্য ইমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্তেকালের পর কবরে মুনকার নকিরের প্রশ্নোত্তর হবে আকিদা সম্পর্কিত। তাই আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি ও রসুল, আসমানি কিতাব, আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নির্ভেজাল আকিদার অধিকারী ব্যক্তিই কেবল নাজাতের আশা করতে পারে। অন্যথায় সকল আমল হবে মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল।

তাওহিদি আকিদার স্বরূপ

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর আগেও কেউ নেই, তাঁর পরেও কেউ নেই। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র তিনিই। তিনি লা-শরিক, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি অক্ষয় অব্যয়, তাঁর ক্ষয় নেই, লয় নেই, পতন নেই। তিনি নিজেই পরিচয় দিয়েছেন কুরআন মাজিদে–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

অর্থ : বলুন, তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়। কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। কেউই তাঁর সমতুল্য নয়। (সুরা ইখলাস)

তিনি দেহ বিশিষ্ট নন। তিনি এমন সত্তা, যিনি স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট নন। তিনি আকৃতি বিশিষ্ট নন। তিনি নিরাকার ও অসীম। রং ও বর্ণ হতে তিনি পবিত্র। তাঁর কোনো নজির নেই। তিনি বেমেছাল। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। এক কথায়, জাত বা সত্তা, গুণাবলি, আইনগত অধিকার ও ইবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক হিসেবে আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই তাওহিদি আকিদা। যার মূল ঘোষণা হলো–

لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই।

তাওহিদি আকিদা পারে মানুষকে ইহকালীন ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও মুক্তি উপহার দিতে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. কীসের বিশুদ্ধতা ছাড়া আমল মূল্যহীন হয়ে যায়?

ক. ইমান খ. তরবিয়ত

গ. ইলম ঘ. সোহবত

২. আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কোন সুরায় বিশেষ বর্ণনা রয়েছে?

ক. সুরা ফালাক খ. সুরা নাস

গ. সুরা ইখলাস ঘ. সুরা কাউসার

৩. عَقِيْدَةٌ শব্দটির বহুবচন কী?

ক. عقائد   খ. عقود

গ. عاقد   ঘ. عقايدة

৪. طيبة শব্দের অর্থ কী?

ক. সুন্দর   খ. পবিত্র

গ. দীর্ঘ   ঘ. সহজ

৫. قل শব্দের মূল অক্ষর (مادة) কী?

ক. و ق ل   খ. ق ل و

গ. ق ى ل   ঘ. ق و ل

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. আকাইদ বলতে কী বুঝ?

২. আকাইদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. মুমিনের জীবনে সহিহ্ আকিদার প্রয়োজনীয়তা লেখ।

৪. سورة الإخلاص আরবিতে লিখে অনুবাদ কর।

৫. তাওহিদি আকিদার স্বরূপ বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

দীনের পরিচয় ও পরিসর

কুরআন মাজিদের আলোকে দীন

দীন (اَلدِّيْنُ) শব্দের অর্থ জীবনব্যবস্থা। কুরআন মাজিদে দীনের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যথা–

(১) প্রভুত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য।

(২) আনুগত্য ও দাসত্ব।

(৩) প্রতিফল ও কর্মফল।

(৪) পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন।

'দীন' আর 'আদ দীন' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন : This is a way (এই একটি পথ) এর পরিবর্তে : This is the way (এই একমাত্র পথ) বলার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয়, দীন আর আদ দীনের মধ্যেও ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে। ইসলাম আল্লাহর নিকট একটি মনোনীত জীবনব্যবস্থা, কুরআন একথা বলেনি। কুরআনের দাবি হলো 'আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা বা চিন্তা ও কর্মপ্রণালি'। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা। (সুরা আলে ইমরান, ১৯)

এই দীন সৃষ্টির শুরু থেকে জীবন সমস্যার সমাধান পেশ করে এবং রাসুলে আকরাম (ﷺ) -এর বিদায় হজের সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম। আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (সুরা মায়েদা, ০৩)

দীন শব্দকে কোনো সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি; বরং সর্বকালের সমগ্র মানুষের জন্য সমুদয় চিন্তা ও কর্মের একমাত্র সুষ্ঠু বিধান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিধান ছাড়া মানুষের মনগড়া কোনো বিধান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

অর্থ : যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবে, তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা আলে ইমরান, ৮৫)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। হজরত আদম (ﷺ) থেকে রসূলে আকরাম (ﷺ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবি-রসুল যে দীনের বা জীবনব্যবস্থার দাওয়াত দিয়েছেন; যে জীবনব্যবস্থা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক তথা জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে পরকালের চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, তার সমন্বিত নাম ইসলাম। এ ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

হাদিসের আলোকে দীন

একবার হজরত জিবরাইল (ﷺ) ছাত্রের মতো আদবের সাথে বসে প্রিয় নবি (ﷺ) কে প্রশ্ন করলেন-

مَا الْإِيْمَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ 'হে আল্লাহর রসুল (ﷺ), ইমান কী?'

আল্লাহর হাবিব জবাবে বললেন, আল্লাহকে বিশ্বাস, আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস, শেষ বিচারের প্রতি বিশ্বাস, মহান প্রভুর সাক্ষাতে বিশ্বাস, তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস হলো ইমান।

আবার প্রশ্ন করলেন- مَا الْإِسْلَامُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ 'হে আল্লাহর রসুল (ﷺ), ইসলাম কী?

প্রিয়নবি (ﷺ) জবাবে বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, মাহে রমযানে সাওম পালন করা হলো ইসলাম।

আবার প্রশ্ন করলেন- مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ 'হে আল্লাহর রসুল (ﷺ), ইহসান কী?'

তিনি বললেন- اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

অর্থ : ইহসান হলো, তুমি আল্লাহর ইবাদত এরূপে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

(মুসনাদু ইমাম আজম রহিমাহুল্লাহ)

প্রিয় নবি (ﷺ) এ তিনটি প্রশ্ন ও উত্তরকে দীন শিক্ষার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা দিলেন। এ হাদিস থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, দীনের মৌলিক দিক তিনটি। ইমান, ইসলাম ও ইহসান। অন্তরের বিশ্বাস, বাহ্যিক আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে বাস্তব প্রশিক্ষণ, তারই সমষ্টিগত নাম দীন।

ইহসানের ধরনঃ

ইহসান দু'ধরনের। যথা–

১। حُصُوْلُ اَلْمُنْجِيَاتِ তথা মুক্তির উপাদানসমূহ অর্জন করা।

২। تَرْكُ اَلْمُهْلِكَاتِ তথা ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকা।

মুক্তির উপাদান (মুনজিয়াত) এর মধ্যে রয়েছে কুফরমুক্ত ইমান, শিরকমুক্ত ইবাদত, ইখলাস বা নিষ্ঠা, ইনাবত বা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যাওয়া, সবর বা সত্যের পথে অবিচল থাকা, তাওয়াক্কুল বা কর্ম সম্পাদনের পর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, কানাআত বা স্বল্পেতুষ্টি, তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, আল্লাহ ও রসুলুল্লাহ (ﷺ), আহলে বাইত, আসহাবে রসুল (ﷺ) কে মহব্বত করা, সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন ইত্যাদি।

ধ্বংসকারী বিষয় (মুহলিকাত) এর মধ্যে রয়েছে কুফর, শিরক, নিফাক, মিথ্যা, চোগলখুরি, প্রতারণা, ধোকা, ওয়াদাভঙ্গ, গিবত, অপব্যয়, রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত, আমানতের খেয়ানত, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লজ্জাহীনতা ইত্যাদি। দীনের মৌলিক ইলম ও তদানুযায়ী আমল যার মধ্যে বিদ্যমান তিনিই দীনদার, তিনিই মুত্তাকি, জান্নাত তাঁর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

ইমানের শাখাসমূহ

ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَـأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْـحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

অর্থ : ইমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'-এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ইমানের একটি অন্যতম শাখা। (বুখারি ১/৬, মুসলিম ১/৪৭)

ইমান পবিত্র বৃক্ষ। যার শাখা-প্রশাখা সত্তরের অধিক। তন্মধ্য থেকে নিম্নে সাতান্নটি শাখা উল্লেখ করা হলো–

১. বিনয়-নম্রতা

২. দয়া ও মমত্ববোধ

৩. সন্তুষ্টি বা তুষ্টি

৪. সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর

৫. আত্মম্ভরিতা পরিহার

৬. প্রতিহিংসা পরিহার

৭. বিদ্বেষ ও শত্রুতা না করা

৮. ক্রোধ সংবরণ

৯. প্রতারণা না করা

১০. পার্থিব মহব্বত ত্যাগ

১১. একত্ববাদের ঘোষণা প্রদান

১২. পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা

১৩. ইলম শিক্ষা করা

১৪. ইলম শিক্ষা দেওয়া

১৫. দোআ করা

১৬. যিকির ও ইস্তিগফার করা

১৭. মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা

১৮. পবিত্রতা রক্ষা করা

১৯. সালাত কায়েম

২০. যাকাত আদায়

২১. সাওম পালন

২২. হজ

২৩. ইতেকাফ

২৪. দীনের দিকে দ্রুত ধাবমান হওয়া

২৫. মানত পূর্ণ করা

২৬. লেনদেনে সততা ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকা

২৭. শপথ রক্ষা

২৮. কাফফারা আদায়

২৯. সালাতে এবং সালাতের বাইরে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা

৩০. কুরবানি করা

৩১. মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা

৩২. শরিয়তের হুকুম মেনে চলা

৩৩. কোনোকিছু গোপন না করে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া

৩৪. বিবাহের মাধ্যমে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা

৩৫. পারিবারিক হক আদায়

৩৬. পিতামাতার সেবা করা

৩৭. সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করা

৩৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

৩৯. মনিবের বা যার অধীনস্থ তার আনুগত্য করা

৪০. ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করা

৪১. ঐক্যবদ্ধ থাকা

৪২. হক্কানি আলেমদের অনুসরণ করা

৪৩. মানুষকে সংশোধন করা

৪৪. ভালো কাজে সহযোগিতা করা

৪৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা

৪৬. হদ্দ বা অপরাধের শাস্তি প্রদান করা

৪৭. হক প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা-সাধনা করা

৪৮. আমানত আদায় করা

৪৯. ঋণ পরিশোধ করা

৫০. প্রতিবেশির হক আদায় করা

৫১. লেনদেনে উত্তম আচরণ করা

৫২. অপব্যয় না করে প্রয়োজন পূরণ করা

৫৩. সালামের জবাব দেওয়া

৫৪. হাঁচির জবাব দেওয়া

৫৫. মানুষের কষ্ট দূর করা

৫৬. তামাশা পরিহার করা

৫৭. কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া

ইসলাম পবিত্র জীবনব্যবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও রসুল (ﷺ) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যাতে রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিধিবিধান। ইসলাম কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ বা কোনো বিশেষ বর্ণের লোকদের জন্য আসেনি; বরং ইসলাম এসেছে সকল মানুষের জন্য। এ দীনের ভিত্তি আল্লাহর রহমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মূল হলেন প্রিয়নবি (ﷺ)। যাঁকে আল্লাহ রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

এ জীবনব্যবস্থার কিছু অংশ কেউ গ্রহণ করবে আবার কিছু অংশ বর্জন করবে, তার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন–

اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .

অর্থ : ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

(সুরা বাকারা, ২০৮)

এ পবিত্র জীবনব্যবস্থায় জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মানুষকে ভালোবাসা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, বড়োকে সম্মান ও ছোটোকে স্নেহ করা শিখিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামকে জানা ও তার বিধান মানা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইলমুত তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

তাযকিয়া (تَزْكِيَةٌ) তাযকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধ করা। যে জ্ঞান অর্জন করলে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক পূতপবিত্র হয়ে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাকে ইলমুত তাযকিয়া বলে।

তাযকিয়া ও তাসাউফের ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শেখা ও আমল করা ফরজে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরজে আইন। মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসা করার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, তদ্রূপ আত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য শায়খ বা মোর্শেদের প্রয়োজন। যিনি আল্লাহ-রসুল ও সালেহ বান্দাগণের তরিকা মোতাবেক তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থ : সে ব্যক্তিই সফলকাম, যে তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি লাভ করে, তাঁর রবের নামের যিকির করে এরপর সালাতে মনোনিবেশ করে। (সুরা আলা, ১৪-১৫)

আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে তাযকিয়া, দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিশুদ্ধ অন্তর বা তাসাউফের সাথে যিকির করা এবং তৃতীয় পর্যায়ে পবিত্র অন্তরে সালাত আদায় করার কথা বলেছেন। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরে যিকির ও বাহ্যিক সালাত আদায় এ তিনটি কাজই একজন মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. দীন শব্দের অর্থ কী?

ক. জীবনব্যবস্থা খ. চরিত্র গঠন

গ. ধর্ম পালন ঘ. আইন প্রণয়ন

২. দীনের মৌলিক দিক কয়টি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের জ্ঞান অর্জনের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৪. دين শব্দের বহুবচন কী?

ক. دائن খ. ديان

গ. اديان ঘ. ديونة

৫. ইহসানের ধরণ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৬. হাদিসের আলোকে ইমানের শাখা কয়টি?

ক. সত্তটিরও অধিক খ. আশিটিরও অধিক

গ. নব্বইটিরও অধিক ঘ. একশতটিরও অধিক

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. কুরআন মাজিদের আলোকে দীনের পরিচয় দাও।

২. হাদিসের আলোকে দীনের পরিচয় দাও।

৩. ইহসানের ধরণ কয়টি ও কী কী? লেখ।

৪. ইমানের ২০টি শাখা লেখ।

৫. "ইসলাম পবিত্র জীবনব্যবস্থা" ব্যাখ্যা কর।

৬. ইলমুত তাযকিয়ার পরিচয় দাও।

৭. ইলমুত তাযকিয়ার প্রয়োজনীয়তা দলিলসহ লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল ইমান বিল্লাহ

اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ

প্রথম পাঠ

আত তাওহিদ ফিয্যাত

اَلتَّوْحِيْدُ فِى الذَّاتِ

তাওহিদ ফিয্যাত-এর ধারণা

اَلتَّوْحِيْدُ فِى الذَّاتِ অর্থ সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। চিরন্তন অবিনশ্বর অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার কথা মেনে নেওয়াই তাওহিদ ফিযযাত। তিনি একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্ত্বা। তার কোনো শরিক নেই। তিনি اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ তথা চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন–

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ– اللهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর কেউ তার সমতুল্য নয়। (সুরা ইখলাস)

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারে কাউকে অংশীদার মানলে আল্লাহ তাআলার মূল সত্তায় শিরক হয়। যেমন : খ্রিষ্টানদের তিন খোদায় বিশ্বাস, অন্যান্য জাতির দেব-দেবিকে আল্লাহর জাতের অংশীদার মনে করা; অথচ আল্লাহর অনুরূপ কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থ : তাঁর সমতুল্য কোনো কিছুই নেই এবং তিনি সব কিছুই শুনেন দেখেন। (সুরা শুরা, ১১)

ইলাহের পরিচয়

ইলাহ (إِلٰـهٌ) শব্দের অর্থ উপাস্য, মাবুদ, প্রভু। বহুবচনে آلِهَةٌ; ইলাহ একজন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰـهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : তোমাদের ইলাহ একজন। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। (সুরা বাকারা, ১৬৩)

একাধিক ইলাহ থাকার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থ : যদি (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে) আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ থাকত, তবে তা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র মহান।

(সুরা আম্বিয়া, ২২)

এক আল্লাহর ঘোষণা এবং মুহাম্মদ (ﷺ) কে মানার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّار

অর্থ : যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল; আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর জাহান্নামকে হারাম করবেন।

(মিশকাত, হাদিস নং ১৫)

তাওহিদুল উলুহিয়্যার পাঁচটি দিক রয়েছে-

১. আত-তাওহিদ ফিল খালক (اَلتَّوْحِيْد فِي اَلْخَلْقِ) আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা।

২. আত-তাওহিদ ফিল ইবাদত (اَلتَّوْحِيْد فِي اَلْعِبَادَةِ) ইবাদতের একমাত্র হকদার আল্লাহ।

৩. আত-তাওহিদ ফিল কুদরাত (اَلتَّوْحِيْد فِي اَلْقُدْرَةِ) আল্লাহ একমাত্র নিরঙ্কুশ ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

৪. আত-তাওহিদ ফিল ইলম (اَلتَّوْحِيْد فِي اَلْعِلْمِ) দৃশ্য অদৃশ্য সকল জ্ঞানের নিরঙ্কুশ অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৫. আত-তাওহিদ ফিদ দোআ (اَلتَّوْحِيْد فِي اَلدُّعَاءِ) সকল দোআ একমাত্র তার কাছেই করা যাবে আর কারো কাছে নয়।

তাই لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ এ কালেমার বাস্তবায়ন তখনই হবে, যখন উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে এ সকল বিষয় নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে মানা হবে।

আল্লাহ তাআলার আরশের পরিচিতি

আরশ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। আরশ (اَلْعَرْشُ) শব্দের অর্থ : اَلْمُلْكُ রাজত্ব, سَرِيْرُ اَلْمَلِكُ রাজ সিংহাসন, ছাদ, মাচা, শক্তি, গোত্র ইত্যাদি। (মুজামুল ওয়াফী, লিসানুল আরব)

কুরআন মাজিদে আরশ শব্দটিকে পঁচিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ পৃথিবী থেকে সাত আসমান পার হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সত্তর হাজার নুরের স্তর অতিক্রম করে আল্লাহর আরশ। এ আরশ এতই মর্যাদাবান যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

অর্থ : তিনি মহান আরশের রব। (সুরা তওবা, ১২৯)

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ বলা হয়। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার সাথে আমাকে আলাপ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সে ফেরেশতার কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত যে দূরত্ব তা কোনো দ্রুতগামী ঘোড়া অতিক্রম করতে সাতশত বছর লাগবে। (কাশফুল আসরার, ৩/৩৬২)

আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা যদি এত বড়ো হন, তাহলে আরশ কত বড়ো। ইমাম জাফর সাদেক (ﷺ) বলেন, আরশ প্রতিদিন সত্তর হাজার নুরের রং ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলার কুরসির পরিচিতি

কুরসি (اَلْكُرْسِيُّ) আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। কুরসি (كُرْسِيٌّ) শব্দের অর্থ : চেয়ার, আসন, সিংহাসন। বহুবচনে كَرَاسِيُّ। আল্লাহ তাআলার আরশে আযিমের উপর কুরসি অবস্থিত। আল্লাহ তাআলার কুরসি যে কত বড়ো তা আল্লাহ তাআলা নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন–

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا .

অর্থ : তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।
(সুরা বাকারা, ২৫৫)

কুরসি শব্দটি কুরআন মাজিদে ২ বার এসেছে। উক্ত আয়াতে বোঝা যায় যে, সাত আসমান সাত যমিন কুরসিতে জায়গা হয়।

হজরত হাসান বসরী (رحمه الله) বলেন : আরশ থেকে কুরসি অনেক উপরে। আরশের উপরে আলো, অন্ধকার, পানি ও বরফের চারটি পর্দা রয়েছে। এক একটি পর্দার থেকে অপর পর্দা পাঁচশত বছরের পথ। কুরসির তুলনায় সাত আসমান সাত যমিন বিশাল মরুভূমিতে একটি সর্ষে দানার মত। আবার আরশের তুলনায় কুরসি একটি সর্ষে দানার মত। আরশ বহনকারী ফেরেশতা আট জন। আর কুরসি বহনকারী ফেরেশতা চারজন। (কাশফুল আসরার -৩/৬৯৪, ৮/৪৫৩)

আরশ, কুরসি ও লাওহে কলম সবই আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিশানা। যে বিস্ময়কর কুদরতসমূহ আমাদের প্রিয় নবি (ﷺ) মিরাজ সফরে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবেই দেখেছেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اِلٰهٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. উপাস্য খ. মালিক

গ. অনাদি ঘ. অনন্ত

২. "আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা" উক্তিটি কোন তাওহিদকে নির্দেশ করে?

ক. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْخَلْقِ খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْقُدْرَةِ

গ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَةِ ঘ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِلْمِ

৪. الصمد শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রধান খ. অভিভাবক

গ. মূল ঘ. অমুখাপেক্ষী

৪. তাওহীদুল উলুহিয়্যার কয়টি দিক আছে?

ক. ৫টি খ. ৬টি

গ. ৭টি ঘ. ৮টি

৫. كرسى শব্দটি কুরআন মাজিদে কয়বার এসেছে?

ক. ১ বার খ. ২ বার

গ. ৩ বার ঘ. 8 বার

৫. আরশ বহনকারী ফেরেশতা কয়জন?

ক. ৫ জন খ. ৬ জন

গ. ৭ জন ঘ. ৮ জন

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. اَلتَّوْحِيْدُ فِي الذَّاتِ এর পরিচয় দলিলসহ লেখ?

২. তাওহিদুল ওলুহিয়্যার কয়টি দিক ও কী কী? লেখ।

৩. আল্লাহ তাআলার আরশের পরিচয় দাও।

৪. আল্লাহ তাআলার কুরসির পরিচয় দলিলসহ লেখ।

৫. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

আত তাওহিদ ফিস সিফাত

اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ

আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামের প্রতি ইমান

আত তাওহিদ ফিস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ) বলতে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা বোঝায় যে, আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত ও ভূষিত। মহান আল্লাহ্ সকল পূর্ণতার গুণে একক ও অদ্বিতীয়। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী (রহ.) এর মতে–

আল্লাহ তাআলার সিফাতে জাতিয়া (صِفَاتٌ ذَاتِيَةٌ) তথা সত্তাগত গুণাবলি আটটি। যথা–

১. হায়াত : আল্লাহ চিরঞ্জীব, অনাদি, অনন্ত, তিনি সমগ্র সৃষ্টির উৎস, যাকে ইচ্ছা অস্তিত্ব দান করেন।

২. ইলম বা জ্ঞান : আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে সমভাবে অবগত। তিনি عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ বা অন্তর্যামী।

৩. ইচ্ছা ও সংকল্প : তিনি নিজ ইচ্ছা ও সংকল্প মোতাবেক বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ .

অর্থ : যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।
(সুরা আল ইমরান, ২৬)

কুরআনে এসেছে– فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

অর্থ : তিনি তাই করেন যা ইচ্ছা করেন। (সুরা বুরুজ, ১৬)

৪. কুদরত ও শক্তি : বিশ্বলোকের গতি ও স্থিতি সবই আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার অধীন।

৫. শ্রবণ শক্তি : سَمِيعٌ বা সর্বশ্রোতা হওয়ার গুণ একজনেরই তিনি হলেন মহান আল্লাহ। গোপনে, প্রকাশ্যে, ইশারা-ইঙ্গিতে সৃষ্টির সকল কথা আল্লাহ শুনতে পান।

৬. দৃষ্টি শক্তি : بَصِيرٌ অর্থ আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। সৃষ্টির সবকিছু দেখেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

৭. কালাম বা কথা : আল্লাহ তাআলার কালাম অসীম, যেমন তাঁর সত্তা অসীম। তাঁর কালাম কাদিম বা চিরন্তন। মাখলুক বা সৃষ্ট নয়।

৮. তাকবিন (تَكْوِيْنٌ) বা সৃষ্টি ক্ষমতা : আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম, আসমান-জমিন সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এছাড়াও আল কুরআনে তাঁর মোট ৯৯ টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। এ ৯৯ টি গুণবাচক নাম তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. সিফাতে জামালি

খ. সিফাতে জালালি

গ. সিফাতে কামালি

বস্তুত সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা যেমন এক-অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে গুণাবলি এবং সিফাতের মধ্যেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত গুণে তাঁর কোনো শরিক, সমকক্ষ নেই। যে সমস্ত গুণাবলি আল্লাহ তাআলার নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় হাবিবের জন্য ব্যবহার করেছেন, সে সবের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলার সিফাত স্রষ্টা হিসেবে নিরঙ্কুশ। আর তাঁর হাবিবের সিফাত সৃষ্টি হিসেবে অনন্য ও আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সীমা-পরিসীমার সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম থেকে তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে কিছু নাম জেনেছ। বাকি নামগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. اَلْقُدُّوْسُ - অতি পবিত্র
২. اَلسَّلَامُ - শান্তিদাতা
৩. اَلْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তাবিধায়ক
৪. اَلْمُهَيْمِنُ - রক্ষক
৫. اَلْبَارِئُ - উদ্ভাবন কর্তা
৬. اَلْمُصَوِّرُ - রূপদাতা
৭. اَلْغَفَّارُ - অতি ক্ষমাশীল
৮. اَلْقَهَّارُ - মহাপরাক্রান্ত
৯. اَلْوَهَّابُ- মহাদাতা
১০. اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা
১১. اَلْفَتَّاحُ - বিজয়দাতা
১২. اَلْقَابِضُ - সংকোচনকারী
১৩. اَلْبَاسِطُ - সম্প্রসারণকারী
১৪. اَلْخَافِضُ - অবলম্বনকারী
১৫. اَلرَّافِعُ - উন্নতিদাতা
১৬. اَلْمُعِزُّ -সম্মানদাতা

১৭. اَلْمُذِلُّ -অপমানকারী
১৮. اَلْحَكَمُ - মীমাংসাকারী
১৯. اَلْعَدْلُ - ন্যায়নিষ্ঠ
২০. اَلْحَلِيْمُ - পরম সহনশীল
২১. اَلشَّكُوْرُ - গুণগ্রাহী
২২. اَلْكَبِيْرُ - শ্রেষ্ঠ
২৩. اَلْمُقِيْتُ - শক্তিদাতা
২৪. اَلْحَسِيْبُ - হিসাবগ্রহণকারী
২৫. اَلْجَلِيْلُ - মহিমান্বিত
২৬. اَلْكَرِيْمُ - অনুগ্রহকারী
২৭. اَلرَّقِيْبُ - তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক
২৮. اَلْمُجِيْبُ - আহ্বানে সাড়াদানকারী
২৯. اَلْوَاسِعُ - সর্বব্যাপ্ত
৩০. اَلْبَاعِثُ - পুনরুত্থানকারী
৩১. اَلْحَقُّ - সত্য
৩২. اَلْوَكِيْلُ - কর্মবিধায়ক
৩৩. اَلْقَوِىُّ -শক্তিধর
৩৪. اَلْمَتِيْنُ - মহাপরাক্রমশালী
৩৫. اَلْوَلِيُّ - অভিভাবক
৩৬. اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত
৩৭. اَلْمُحْصِيْ - পরিব্যাপ্ত
৩৮. اَلْمُعِيْدُ - পুনঃসৃষ্টিকারী
৩৯. اَلْمُحْيِيْ- জীবনদাতা
৪০. اَلْمُمِيْتُ- মৃত্যুদাতা
৪১. اَلْوَاجِدُ- সর্বপ্রাপক
৪২. اَلْمَاجِدُ- মহীয়ান
৪৩. اَلْوَاحِدُ -একক
৪৪. اَلْقَادِرُ- ক্ষমতাবান
৪৫. اَلْمُقْتَدِرُ - প্রবল
৪৬. اَلْمُقَدِّمُ - অগ্রবর্তীকারী
৪৭. اَلْمُؤَخِّرُ - পশ্চাদবর্তীকারী
৪৮. اَلظَّاهِرُ - প্রকাশ্য
৪৯. اَلْبَاطِنُ - গুপ্ত
৫০. اَلْمُتَعَالُ - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান
৫১. اَلْبَرُّ - কৃপাময়
৫২. اَلتَّوَّابُ - তওবা কবুলকারী
৫৩. اَلْمُنْتَقِمُ - দণ্ডবিধায়ক
৫৪. اَلْعَفُوُّ - ক্ষমাকারী
৫৫. اَلرَّؤُوْفُ - দয়ার্দ্র
৫৬. مَالِكُ الْمُلْكِ - বিশ্বের অধিপতি
৫৭. اَلْمُقْسِطُ - ন্যায়পরায়ণ
৫৮. اَلْجَامِعُ - একত্রকারী

৫৯. اَلْغَنِىُّ - অভাবমুক্ত

৬০. اَلْمُغْنِىُ - অভাব মোচনকারী

৬১. اَلْمَانِعُ - বারণকারী

৬২. اَلضَّارُّ - অকল্যাণকারী

৬৩. اَلنَّافِعُ - কল্যাণকারী

৬৪. اَلنُّوْرُ - জ্যোতি

৬৫. اَلْهَادِىُ - পথপ্রদর্শক

৬৬. اَلْبَقِىُّ - চিরস্থায়ী

৬৭. اَلْوَارِثُ - স্বত্বাধিকারী

৬৮. اَلرَّشِيْدُ - সুপথনির্দেশক

৬৯. اَلصَّبُوْرُ - ধৈর্যশীল

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. আল্লাহ তাআলার সিফাতে যাতিয়া (صِفَاتٌ ذَاتِيَةٌ) কয়টি?

ক. ৫ টি
খ. ৬ টি
গ. ৭ টি
ঘ. ৮ টি

২. আল্লাহ তাআলার সিফাত اَلْمُهَيْمِنُ এর অর্থ কী?

ক. পরাক্রান্ত
খ. ন্যায়নিষ্ঠ
গ. সহনশীল
ঘ. রক্ষক

৩. আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে

গ. ৫ ভাগে ঘ. ৬ ভাগে

৪. اَلْعَفُوُّ শব্দের অর্থ কী?

ক. গুণগ্রাহী খ. ন্যায়নিষ্ঠ

গ. ক্ষমাকারী ঘ. অনুগ্রহকারী

৫. কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ তাআলার কয়টি গুণবাচক নাম উল্লেখ আছে?

ক. ৯৬টি খ. ৯৭টি

গ. ৯৮টি ঘ. ৯৯টি

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ বলতে কী বুঝ?

২. সিফাতে জাতিয়া কয়টি ও কী কী? লেখ।

৩. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

৪. আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী? লেখ।

৫. আল্লাহ্ তাআলার বিশটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখ।

তৃতীয় পাঠ

আত তাওহিদ ফিল হুকুক

اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْحُقُوْقِ

সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার

আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে তাওহিদ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নমরুদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ যারাই খোদা দাবি করেছে; কেউ নিজেদেরকে স্রষ্টা বা ইলাহ বলে ঘোষণা দেয়নি। সবাই বলেছে–

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى

অর্থ : আমি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো রব। (সুরা নাজিআত, ২৪)

সকল নবি-রসুল এবং আসমানি কিতাবের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো রব বা সার্বভৌম ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ فَـأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ.

অর্থ : তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব। সর্বময় কর্তৃত্ব তারই। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ (নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী) নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

(সুরা যুমার, ৬)

তাওহিদে বিশ্বাসী মুসলমানদের এ সার্বভৌমত্বের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রতিদিন প্রতি রাকাত সালাতে সুরা ফাতেহা তিলাওয়াতের বিধান দেয়া হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ : জগতসমূহের রব সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। (সুরা ফাতিহা, ১)

কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সুরায়ও আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে আনুগত্যের তালিম দিয়ে বলা হয়েছে–

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

অর্থ : বলুন, আমি মানুষের রবের নিকট আশ্রয় চাই। (সুরা নাস, ১)

মানুষ আল্লাহ তাআলার খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই বিধান বাস্তবায়ন করবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এটাই তাওহিদি আকিদা।

আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও তাঁর রসুল (ﷺ) প্রদর্শিত বিধানই মানতে হবে

ইসলাম নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Complete code of life)। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, শাসন সকল ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানময় জীবনব্যবস্থা ইসলাম। এ ইসলামের কালিমা হলো–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

এ ঘোষণার মধ্যেই রয়েছে তাওহিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থার মূল নির্যাস। নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা, আর প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথই একমাত্র মুক্তির পথ–এ বিশ্বাসই ইমানের মূলকথা। এ তাওহিদি ঘোষণা হবে–

رَبُّنَا اللّٰهُ لَـهُ الْمُلْكُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা আমাদের রব রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ছাড়া নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আর কারো নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

অতএব, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান। যেহেতু তিনি সবকিছুর মালিক, বিধানদাতা, রিযিকদাতা, সকল সমস্যার সমাধানকারী, তাই আইন চলবে তাঁর। একজন মুসলমান তার ইমানকে ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-বিধান মেনে নিতে পারে না। তাঁরই আইন বাস্তবায়ন করেছেন প্রিয়নবি (ﷺ)। তাই প্রিয়নবি (ﷺ) এর প্রদর্শিত পথই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। এর বাইরে কোনো আইন মেনে নেওয়া পথভ্রষ্টতা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِينًا.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারী সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকারী থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সুরা আহযাব, ৩৬)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে?

ক. সমাজ
খ. রাষ্ট্র
গ. জনগণ
ঘ. আল্লাহ

২. কে খোদায়ি দাবি করেছিল?

ক. কারুন
খ. হামান
গ. ফেরাউন
ঘ. কিনান

৩. اَلْأَعْلَى শব্দের অর্থ কী?

ক. বড়
খ. উত্তম
গ. সুন্দর
ঘ. প্রবল

৪. رَبَّنَا শব্দের অর্থ কী?

ক. আমাদের রব
খ. তাদের রব
গ. তোমাদের রব
ঘ. তার রব

৫. اَلْمُلْكُ শব্দের অর্থ কী?

ক. রাজা
খ. বাদশাহ
গ. আমির
ঘ. সর্বময় কর্তৃত্ব

৬. أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى বাক্যটি কে বলেছে?

ক. হামান খ. আজিজে মিসর

গ. ফিরাউন ঘ. আবু জাহল

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা কী? বর্ণনা কর।

২. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْحُقُوْقِ বলতে কী বুঝ? লেখ।

৩. "সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ও রসুল (সঃ)-এর বিধান মানতে হবে" ব্যাখ্যা কর।

৪. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। আয়াতের ব্যাখ্যা কর।

৫. সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন? উল্লেখ কর।

চতুর্থ পাঠ

আত তাওহিদ ফিল ইবাদত

اَلتَّوْحِيْدُ فِي الْعِبَادَاتِ

ইবাদতের পরিচিতি

اَلْعِبَادَاتُ শব্দটি اَلْعِبَادَةُ শব্দের বহুবচন। শব্দটি عَبْدٌ থেকে নির্গত। عَبْدٌ এর অর্থ চরম বিনয়ের সাথে অনুগত হওয়া। اَلْعِبَادَةُ অর্থ اَلذِّلَّةُ বা আনুগত্য, দাসত্ব ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে ইবাদত হলো–

اَلْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ.

অর্থ: মুহাব্বত, বিনয় ও ভয়ের সাথে আনুগত্য করার নাম ইবাদত।

পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বত, সর্বোচ্চ বিনয় ও চরম ভয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত বলা হয়। মানব জাতির প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মানব জাতি, তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে; যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সুরা বাকারা, ২১)

জিন-ইনসান, পশু-পাখি, গাছ-পালা, লতা–গুল্ম, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সিন্ধু-মহাসিন্ধু, আকাশ-বাতাস, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নেবুলা, ছায়াপথ, আরশ-কুরসি, লাওহ্ কলম, ফেরেশতাসহ সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে, সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। স্রষ্টা, মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি ও রব হিসেবে তিনিই একমাত্র হকদার ইবাদত পাওয়ার; অন্য কোনো সৃষ্টি ইবাদতের অধিকারী হতে পারে না। কুরআনে এসেছে–

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ.

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তাই তোমরা তারই ইবাদত করো। (সুরা আনআম, ১০২)।

ইবাদতের স্তরসমূহ

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা প্রত্যেক বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য। নিয়ত ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দাদের মধ্যে কেউ ইবাদত করে জান্নাতের আশায় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, কেউ ইবাদত করে বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য, আবার কেউ ইবাদত করে আল্লাহর **মুহাব্বত** ও সন্তুষ্টির জন্য। এ দৃষ্টিকোণে ওলামায়ে কেরাম ইবাদতকে নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন–

প্রথম স্তর : জান্নাত লাভের আশায় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত করা।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থ : তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সুরা সাজদা, ১৬)

দ্বিতীয় স্তর : বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য ইবাদত করা।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ : হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সুরা বাকারা, ২১)

তৃতীয় স্তর : আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করা। এটিই সর্বোত্তম ইবাদত।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

অর্থ : আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্টভাবে। (সুরা বাইয়্যেনাহ, ৫)

শুদ্ধ ইবাদত হলো বান্দা হিসেবে আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদত করা। নবী-রসুল (ﷺ) ও সালফে সালেহীনগণের ইবাদত ছিল শুদ্ধ ও সর্বোচ্চ স্তরের ইবাদত। তারা আল্লাহ তাআলাকে যেমনি ভালোবাসতেন, তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁরা ছিলেন অধিক বিনয়ী।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অর্থ :তাঁরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতো। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তাঁরা ছিল আমার নিকট বিনয়ী। (সুরা আম্বিয়া, ৯০)

ব্যবহারিক দিক থেকে ইবাদত

ব্যবহারিক দিক থেকে ইবাদত প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) আনুষ্ঠানিক ইবাদত : যে ইবাদতের মধ্যে সময়, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে পালনের বিধিবিধান রয়েছে। যেমন : সালাত, যা সময়মতো আদায় করতে হয়। সাওম, যা নির্ধারিত সময় অর্থাৎ, ফরজ হলে রমজান মাসে আদায় করতে হয়। যাকাত ও হজ, যাদের উপর ফরজ তারা নির্ধারিত সময়ে তা আদায় করতে হবে। এসব ইবাদত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি রয়েছে। প্রথম এ মৌলিক সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসুল। দ্বিতীয়ত সালাত কায়েম করা, তৃতীয়ত যাকাত প্রদান করা, চতুর্থত হজ করা এবং পঞ্চমত রমযান মাসে সাওম পালন করা। (সহিহ বুখারি, ১/৪)

(২) সার্বক্ষণিক ইবাদত : এইসব ইবাদত হচ্ছে– হারাম থেকে বিরত থাকা, হালাল রুযির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো, ন্যায় পথে চলা, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। লেনদেন, ব্যাবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা, সবসময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যগতভাবে ইবাদত

উদ্দেশ্যগতভাবে ইবাদত দু প্রকার। যথা –

(১) اَلْعِبَادَةُ الْمَقْصُوْدَةُ বা মূল কাঙ্ক্ষিত ইবাদত।

(২) اَلْعِبَادَةُ غَيْرُ الْمَقْصُوْدَةِ বা প্রাসঙ্গিক ইবাদত।

সালাত আদায় করা মূল ইবাদত বা ইবাদতে মাকসুদা, আর এ সালাত আদায় করার জন্য অজু প্রাসঙ্গিক ইবাদত। ইবাদত সম্পাদন করা যেভাবে ফরজ, একইভাবে ইবাদত সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ। যেমন : সালাতে কুরআন মাজিদের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা ফরজ, অনুরূপভাবে ঐ তেলাওয়াতকৃত অংশটি ভালোভাবে তেলাওয়াত করতে জানাও ফরজ।

ইবাদত কবুলের শর্তাবলি

ইবাদত সম্পাদন করাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই মাবুদের দেওয়া পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ। আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুল (ﷺ)গণের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন ও অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ইমান ও আকিদা সহিহ হতে হবে। ইবাদত হতে হবে শিরকমুক্ত ও মুহাব্বতপূর্ণ।

ইবাদতে থাকতে হবে إِخْلَاصٌ বা নিষ্ঠা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

অর্থ : নিশ্চিতভাবে আমি আপনার উদ্দেশে মহাসত্যের কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তাই আল্লাহর ইবাদত করুন তারই দীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। (সুরা যুমার, ২)

ইবাদত হতে হবে রিয়া বা লোক দেখানো মানসিকতামুক্ত। ইবাদতে বিন্দুমাত্র রিয়া বা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হলে ইবাদতের যথার্থ প্রতিদান তো পাওয়া যাবেই না, বরং আল্লাহর কঠোর শাস্তি ও গযবের শিকার হতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ : ধ্বংস ঐ সব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা আপন সালাতের প্রতি উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তা করে। (সুরা মাউন, ৪-৬)

ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। পার্থিব কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য ইবাদত বকধার্মিকতা। ইবাদত কবুলের জন্যে থাকতে হবে خُشُوْعٌ وَ خُضُوْعٌ বা মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় ও বিনয়। ইবাদত হতে হবে নির্ভুল।

ইবাদতের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْـجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমি জিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত, ৫৬)

ইবাদত বা বন্দেগি মনিবের হুকুম হিসেবে তার মহব্বতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে পালন করতে হবে। যে ইবাদতে মহব্বত নেই তা অন্তসার শূন্য। তিনি নিজেই বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক মহব্বত করে। (সুরা বাকারা, ১৬৫)

তিনি নির্দেশ দিয়েছেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

অর্থ : আপনার রবের নামের যিকির করতে থাকুন এবং সবকিছু ছেড়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর হয়ে যান।

(সুরা মুজ্জাম্মিল, ৮)

এ জন্য বলা হয়– لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

অর্থ : অন্তরের একনিষ্ঠতা ছাড়া সালাত পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হয় না।

তাই, যার ইবাদত করবো তাঁকে চেনার জন্য, পাওয়ার জন্য, দেখার জন্য ইবাদত করব। তাঁর প্রতি মহব্বত যত বেশি হবে, ততই ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা যাবে এবং তত তাড়াতাড়ি ইবাদত কবুল হবে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ওসিলা গ্রহণ

ওসিলা (اَلْوَسِيْلَةُ) শব্দের অর্থ হলো, اَلتَّوَصُّلُ إِلٰى شَيْءٍ بِرُغْبَةٍ অর্থাৎ, প্রবল আগ্রহের সাথে কোনো বস্তু হাসিলের প্রচেষ্টা চালানো। কোনো বস্তুর মাধ্যমে অন্য বস্তুর নৈকট্য লাভ করাকে ওসিলা বলে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَ ابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর।

(সুরা মায়িদাহ, ৩৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

অর্থ : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করে। (সুরা ইসরা, ৫৭)

আল কুরআনে বর্ণিত আয়াতে ওসিলা অর্থ সওয়াব পাওয়ার জন্য যে মাধ্যম তালাশ করা হয়। আনুগত্য, নৈকট্য লাভ এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য যে সকল উপায় উপকরণ প্রয়োজন তাই বোঝানো হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) প্রিয়নবি (ﷺ) এর ওসিলা দিয়ে দোআ করেছেন। যেমন হজরত উসমান বিন হুনাইফ (ﷺ) অন্ধ হয়ে গেলে তিনি দোআ করেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ ﷺ إِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ إِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নবিয়ে রহমতের ওসিলায় আমি আপনার কাছে চাই এবং আপনার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ বা একনিষ্ঠভাবে তাকিয়ে আছি। হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমি আমার প্রয়োজন পূরণে আপনার ওসিলা করে আমার রবের দিকে চেয়ে আছি। হে আল্লাহ! আমার জন্য তাঁর শাফাআত কবুল কর। (মুসনাদু আহমদ)

ইমদাদুল ফতওয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

اَلتَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ وَ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعِظَامِ جَائِزٌ بِأَنْ يَكُوْنَ السُّؤَالُ مِنَ اللهِ وَ التَّوَسُّلُ بِنَبِيِّه وَ وَلِيِّهِ

অর্থ : নবি ও অলিগণের ওসিলা করা জায়েয। যদি চাওয়া পাওয়া আল্লাহর কাছে হয় আর নবি এবং ওলিগণকে শুধু মাধ্যম বা উপায় হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

হজরত ইমাম আযম আবু হানিফা (ﷺ) প্রিয়নবি (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বলেন–

أَنْتَ الَّذِيْ لَمَا تَوَسَّلَ ادَمُ * مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَ هُوَ أَبَاكَ
وَ بِكَ الْخَلِيْلُ دَعَا فَعَدَتْ نَارُه * بَرْدًا وَ قَدْ خُمِدَتْ بِنُوْرِ سِنَاكَ

অর্থ : হে রসুল! আপনি তো সেই মহান ব্যক্তি, হজরত আদম (ﷺ) পদস্খলন থেকে আপনাকে ওসিলা করে সফল হয়েছেন। অথচ তিনি আপনার আদি পিতা। আপনার ওসিলা নিয়ে ইব্রাহিম (ﷺ) অগ্নিকুণ্ডে পড়ার সাথে সাথে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আপনার নুরের তাজাল্লিতে আগুন নিভে যায়। (কাসিদায়ে নোমান)

এক কথায় বলা যায়, আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও মালিকানাকে শতকরা একশভাগ মেনে নিয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যতগুলো বৈধ উপায় উপকরণ আছে তা গ্রহণ করাই ওসিলা। আল্লাহ তাআলার নিয়মই হলো তিনি সরাসরি সবকিছু করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো মাধ্যম ছাড়া কিছু দেন না। তাই নিজেই (وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ) ওসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. العبادات শব্দটির একবচন কী?

ক. العبادة　　খ. العبدة

গ. العبودية　　ঘ. العبيدة

২. ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কোনটি?

ক. ইখলাস　　খ. বড় আলেম হওয়া

গ. মসজিদে যাওয়া　　ঘ. তাযকিয়া

৩. ইবাদতের স্তর কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৪. ব্যবহারিক দিক থেকে ইবাদত প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. ২ ভাগে　　খ. ৩ ভাগে

গ. ৪ ভাগে　　ঘ. ৫ ভাগে

৫. কার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত হতে হবে?

ক. রাসুল (সঃ)
খ. ফেরেশতাগণের
গ. মালাকুল মাউত
ঘ. আল্লাহ তায়ালার

৬. মুমিনগণ সর্বাধিক মহব্বত কাকে করে?

ক. আল্লাহ তায়ালা
খ. রাসুল (সঃ)
গ. মা-বাবা
ঘ. সন্তান

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. ইবাদত বলতে কী বুঝ? লেখ।

২. ইবাদতের স্তরসমূহ লেখ।

৩. ব্যবহারিক দিক থেকে ইবাদত কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী? লেখ।

৪. উদ্দেশ্যগতভাবে ইবাদত কত প্রকার ও কী কী লেখ?

৫. ইবাদত কবুলের শর্তাবলী দলিলসহ বর্ণনা কর।

৬. ইবাদতের সাথে মহাব্বতের সম্পর্ক দলিলসহ আলোচনা কর।

৭. রাসুল (সঃ)-এর ওসিলা দিয়ে দোয়া করার বিধান দলিলসহ আলোচনা কর।

পঞ্চম পাঠ

আশ শিরক বিল্লাহ

اَلشِّرْكُ بِاللهِ

শিরকের পরিচয় ও পরিণতি

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ শরিক করা বা অংশীদারিত্ব। خَلَطُ الْمَلِكَيْنِ তথা একটি বস্তুর মালিকানায় দু-জনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর যে শিরক করে, তাকে মুশরিক (مُشْرِكٌ) বলে।

পরিভাষায় اَلْمُشْرِكُ বলা হয়–

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالٰى أَيْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِيْ مُلْكِهِ

অর্থ : যে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় অন্য কারো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করলো, সে মুশরিক।

আল্লাহ তাআলা শিরক থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : শিরক করো না, অবশ্যই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম। (সুরা লুকমান, ১৩)

শিরক প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে–

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيْدًا.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না এবং আল্লাহর সাথে শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সুরা নিসা, ১১৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

অর্থ : মুশরিকরা অপবিত্র। (সুরা তাওবা, ২৮)

তাই মানুষ মাত্রই শিরক থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা চালাতে হবে।

শিরকের প্রকার

শিরক দু প্রকার। যথা–

(১) শিরকে আকবার ও (২) শিরকে আসগার।

(১) শিরকে আকবার (اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ) তথা সবচেয়ে বড়ো শিরক। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা। এ প্রকার শিরককে اَلشِّرْكُ الْجَلِيُّ বা প্রকাশ্য শিরকও বলা হয়।

(২) শিরকে আসগার (اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) বা ছোটো শিরক। ইবাদতের মধ্যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য শামিল রাখা। এ প্রকার শিরককে اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ বা গোপন শিরকও বলে।

শিরকে আকবারের প্রকার

শিরকে আকবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

১। اَلشِّرْكُ فِي الذَّاتِ বা সত্তাগত অংশীদারিত্ব। আল্লাহ তাআলার সত্তার মতো কাউকে বা কোনো শক্তিকে মনে করা।

২। اَلشِّرْكُ فِي الصِّفَاتِ বা গুণাবলিতে শিরক। আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মতো অন্য কারো গুণাবলি আছে এ আকিদা পোষণ করা।

৩। اَلشِّرْكُ فِي الْحُقُوْقِ বা আল্লাহর অধিকারে কাউকে শরিক করা (সৃষ্টি)। সৃষ্টিজগত পরিচালনায় আইন প্রণয়নের অধিকারে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা।

৪। اَلشِّرْكُ فِي الْعِبَادَاتِ বা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) এর নাফরমানী করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা।

শিরকে আকবার বা বড় শিরকের ফলে যে গুনাহ হয়, তাওবা ছাড়া তা মাফ হয় না। শিরকে আকবার বা শিরকে জলি আকিদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাওবা করে ইমানকে শিরকমুক্ত করতে না পারলে নিজেকে ইমানদার দাবি করা যায় না।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরিচয় দিয়ে বলেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং ইমানের সাথে যুলুম তথা শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।

(সুরা আনআম, ৮২)

শিরকে আকবারের পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ : নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সুরা মায়িদাহ, ৭২)

প্রচলিত কতগুলো শিরক

সমাজে প্রচলিত শিরক দু-ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিরক ও

(খ) আমলের ক্ষেত্রে শিরক।

(ক) আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিরক । যেমন–

১। আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির মতো সার্বভৌম ক্ষমতাবান ও তাঁর সমকক্ষ মনে করে অন্য কাউকে ক্ষমতার উৎস মনে করা।

২। আল্লাহ্ তাআলাকে বাদ দিয়ে কোনো দেশ বা শক্তিকে রিজিকের মালিক মনে করা, সমস্যার সমাধানকারী মনে করা।

৩। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে ক্ষমতাবান এরূপ ক্ষমতার মালিক মনে করে কোনো বস্তুর সামনে বা কোনো ব্যক্তির সামনে মাথানত করে তার কাছে শক্তি কামনা করা।

৪। ইবাদতের নিয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা স্থানকে সিজদা করা।

৫। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে মানত করা।

৬। সন্তান, রিজিক, রোগমুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছাড়া সত্ত্বাগতভাবে কেউ মালিক বা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন–এই আকিদা পোষণ করা।

(খ) আমলের ক্ষেত্রে শিরক। যেমন–

১। اَلرِّيَاءُ তথা লোক দেখানো ইবাদত।

২। اَلْخَوْفُ তথা আল্লাহকে ভয় না করে কোনো মানুষকে ভয় করে ইবাদত করা।

৩। ইবাদতের গুরুত্ব না দিয়ে মনগড়াভাবে এমন কোনো ভ্রান্ত পীর-ফকিরের অনুসরণ করা, যারা বলে ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

৪। অন্য মানুষের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে জাদু-মন্ত্র প্রয়োগ করা।

৫। গায়বের সংবাদ জানে এ বিশ্বাস করে গণকের কথায় বিশ্বাস করা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الشرك (শিরক) কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২. কোনটি الشرك الاصغر -এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. মূর্তিপূজা খ. অগ্নিপূজা

গ. জাদু মন্ত্র ঘ. রিয়াযুক্ত ইবাদত

৩। যে শিরক করে তাকে কী বলে?

ক. মুশরিক খ. মুসরিফ

গ. মুনাফিক ঘ. কাফির

৪। শিরকে আকবার কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. ৪ খ. ৫

গ. ৬ ঘ. ৭

৫। সমাজে প্রচলিত শিরক কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। الشرك কাকে বলে? লেখ।

২। الشرك কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩। শিরকে আকবারের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

৪। আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিরকের বর্ণনা কর।

৫। আমলের ক্ষেত্রে শিরকের বর্ণনা কর।

৬। শিরকের পরিণতি ও ভয়াবহতা দলিলসহ বর্ণনা কর।

৭। الشرك الجلي ও الشرك الخفي কাকে বলে? লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়
আল ইমান বিল মালায়েকা
اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব

مَلَائِكَةٌ (মালাইকা) শব্দটি আরবি। এটি مَلَكٌ-এর বহুবচন। মালাইকার পরিচয় হলো–

جِسْمٌ نُوْرِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَايُذَكَّرُ وَلَايُؤَنَّثُ وَلَايَشْرَبُ وَلَايَنَامُ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : এমন নুরানি সত্তা, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তারা পুরুষ বা নারী নন, পানাহার করেন না, ঘুমান না। কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত থাকেন।

কুরআন মাজিদে ৮৮টি আয়াতে اَلْمَلَائِكَةُ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তারা অত্যন্ত জ্যোতির্ময় ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তারা সাধারণত অদৃশ্য থাকে। তাঁদের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দিয়েছেন। ফেরেশতাগণ সকলেই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা আল্লাহর নাফরমানী করেন না। যাঁকে যে কাজে বা দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়, তাঁরা যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা ফরজ। যারা ফেরেশতাদের প্রতি ইমান রাখে না, তারা সুস্পষ্ট ও মারাত্মক গোমরাহিতে নিমজ্জিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

অর্থ : কেউ আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসুল এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সুরা নিসা, ১৩৬)

ফেরেশতাগণ সদা-সর্বদা প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ রত থাকেন। ফেরেশতাগণ যে নুরের সৃষ্টি এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

خُلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ وَ خُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

অর্থ : ফেরেশতাগণকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত হয়েছে।

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ)

এক কথায় বলা যায়, ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি ও আল্লাহর অনুগত সৃষ্টি। তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ইমান বিরোধী। অনুরূপভভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা ও অবতার ইত্যাদি বলা যাবে না।

জিনের পরিচয়

জিন (اَلْجِنُّ) শব্দের অর্থ গোপন থাকা, চোখের আড়াল হওয়া, জিন জাতি। পরিভাষায় জিন হলো–

اَلْجِنُّ جِسْمٌ نَارِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ يُذَكَّرُ وَ يُؤَنَّثُ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنَامُ وَمُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ.

অর্থ : জিন আগুনের তৈরি এমন অস্তিত্বের নাম, যারা কুকুর ও শূকরসহ সকল আকৃতি ধারণ করতে পারে। তারা পুরুষ ও নারী, পানাহার করে, ঘুমায় এবং শরিয়তের বিধানের আওতাভুক্ত।

জিন জাতি দু প্রকার। যথা–

(ক) শায়াতিন, যারা ইবলিসের মতো খোদাদ্রোহী।

(খ) সালেহিন, যারা ইমানদার।

তাদের একটি দল প্রিয়নবি (ﷺ) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন মাজিদে সুরা আল জিনে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। জিন মানুষের শরীরে ভর করে এ কথাও সত্য।

ফেরেশতা ও জিনের মধ্যে পার্থক্য

১। ফেরেশতারা নুরের তৈরি আর জিনেরা আগুনের তৈরি।

২। ফেরেশতাগণের আমলের হিসাব নেই কিন্তু জিনদের হিসাব নেওয়া হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত, ৫৬)

৩। ফেরেশতাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বিষয় নেই। কিন্তু জিন জাতির মধ্যে ভালো-মন্দ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ফেরেশতাগণ ও তাদের কাজ

আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের মধ্যে একদল রয়েছেন, যাদেরকে مُقَرَّبُوْنَ (মুকাররাবুন) বলা হয়। এদের সংখ্যা সত্তরজন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চারজন বড়ো-বড়ো দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা হলেন–

১। হজরত জিবরাইল (ﷺ): তাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো, আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নবি-রসুলগণের নিকট পৌছানো। এছাড়াও আল্লাহ যখন যা নির্দেশ প্রদান করেন, তা কর্তব্যরত ফেরেশতাগণের নিকট পৌছিয়ে দেয়া।

হজরত জিবরাইল (ﷺ) এর ছয়শত পাখা রয়েছে। তিনি রাসুলে (ﷺ) এর দরবারে কখনো কখনো হজরত দাহিয়াতুল কালবি (ﷺ) এর আকৃতি ধারণ করে আসতেন। আল কুরআনে তাকে اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ হিসেবে খেতাব করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

অর্থ : বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাইল একে নিয়ে এসেছেন আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। (সুরা শুআরা ১৯৩-১৯৪)

২। হজরত মিকাইল (ﷺ): তার দায়িত্ব হলো সৃষ্টি জগতের জন্য আহারাদি, ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করা, সকল জীবের জীবিকা বণ্টন করা।

৩। হজরত ইসরাফিল (ﷺ): তিনি শিংগায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে শিংগায় ফুঁ দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হবে।

৪। হজরত আযরাইল (ﷺ): কুরআন ও হাদিসে তাকে مَلَكُ الْمَوْتِ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি সকল জীবের রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন যারা তাঁরা হলেন–

৫। জান্নাতের জিম্মাদার, যাঁর নাম রেদওয়ান (رِضْوَانٌ)।

৬। জাহান্নামের রক্ষক, যাঁর নাম মালেক (مَالِكٌ)।

৭। একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর আরশ বহন করেন। যাঁদেরকে حَمَلَةُ الْعَرْشِ বা আরশ বহনকারী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের সর্ম্পকে বলেন–

وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থ : আটজন ফেরেশতা তাঁদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে।

(সুরা আল হাককা, ১৭)

৮। মহান আরশের আশে পাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁদের মুকাররাবুন (مُقَرَّبُوْنَ) বলা হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১.আল কুরআনের কয়টি আয়াতে الملائكة সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?

ক. ৮৫ টি খ. ৮৬ টি
গ. ৮৭ টি ঘ. ৮৮ টি

২. সৃষ্টিজগতের জন্য জীবিকা বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ফেরেশতা?

ক. হজরত জিবরাইল (ﷺ) খ. হজরত মিকাইল (ﷺ)
গ. হজরত ইসরাফিল (ﷺ) ঘ. হজরত রিদওয়ান (ﷺ)

৩. ملائكة শব্দটির একবচন কী?

ক. ملكة খ. ملوك
গ. ملك ঘ. ملاك

৪। ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত　　ঘ. মুস্তাহাব

৫। জিন শব্দের অর্থ কী?

ক. কঠোর থাকা　　খ. গোপন থাকা

গ. দৃশ্যমান থাকা　　ঘ. নম্র থাকা

৬। জিন জাতি কয় প্রকার?

ক. ২　　খ. ৩

গ. ৪　　ঘ. ৫

৭। আরশ বহনকারী ফেরেশতা কয়জন?

ক. ৬　　খ. ৭

গ. ৮　　ঘ. ৯

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। ملائكة এর পরিচয় দাও।

২। জিন ও ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব দলিলসহ আলোচনা কর।

৪। জিন জাতির পরিচয় দাও।

৫। জিন জাতি কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৬। উল্লেখযোগ্য ফেরেশতাগণের নাম ও তাদের কার্যাবলী আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আল ইমান বির রুসুল

اَلْإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ

প্রথম পাঠ

নবি ও রসুলের পরিচয়

নবির পরিচয়

নবি (نَبِيٌّ) শব্দের অর্থ সংবাদদাতা। শব্দটি اَلنُّبُوَّةُ মাসদার ও نَبَأٌ শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। نَبَأٌ শব্দের অর্থ সংবাদ। আবার কারো কারো মতে, এর মূল হচ্ছে نَبْوٌ (নাবউন)। এর অর্থ হলো, উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত সম্মান সম্পন্ন। শরিয়তের পরিভাষায়–

اَلنَّبِيُّ هُوَ الْمَبْعُوْثُ لِتَقْرِيْرِ شَرْعٍ مِنْ قَبْلِهِ.

অর্থ : নবি হলো প্রেরিত এমন বান্দা, যাঁকে তার পূর্বের শরিয়ত বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

রসুলের পরিচয়

রসুল (رَسُوْلٌ) শব্দের অর্থ বার্তাবাহক, দূত, বাণীবাহক ইত্যাদি। শব্দটি اَلرِّسَالَةُ মাসদার থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো চিঠি, পত্র, বার্তা বা পুস্তক। আর رُسُلٌ হলো এর বহুবচন। শরিয়তের পরিভাষায়–

اَلرَّسُوْلُ مَنْ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ جَدِيْدٍ.

অর্থ : যাকে নতুন শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে, তাকে رَسُوْلٌ বলা হয়।

হজরত জিবরাইল (ﷺ) আল্লাহর বাণী নবি রসুলগণের নিকট পৌছাতেন। নবিগণের দায়িত্ব বা কাজকে নবুওয়াত ও রসুলগণের দায়িত্ব বা কাজকে রিসালাত বলা হয়।

رَسُوْلٌ শব্দটি সাধারণত বচন ও লিঙ্গভেদ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয়। তাই একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ কিংবা পুংলিঙ্গ সর্বাবস্থায় رَسُوْلٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এর দ্বিবচন ও বহুবচন হয়। পবিত্র কুরআনে رَسُوْلٌ শব্দ একবচনে ২৩৭ বার ও বহুবচনে ৯ বার এসেছে। আর نَبِيٌّ শব্দটি একবচনে ৫৪ বার এবং বহুবচনে ২১ বার কুরআনে এসেছে।

লক্ষাধিক নবি ও রসুল আল্লাহর দীনের প্রচার ও দীন বাস্তবায়নের দাওয়াত দিয়েছেন।

নবি ও রসুল সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا

অর্থ : সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবিগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। (সুরা বাকারা, ২১৩)

নবি ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য

رَسُوْلٌ ও نَبِيٌّ উভয় শব্দ পবিত্র কুরআনে প্রায় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কিছু কিছু দিক রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১। নবি ও রসুলের পার্থক্য মূলত দাওয়াতের ক্ষেত্রে। নবিগণের দাওয়াত ছিলো সীমিত পরিসরে আর রসুলগণের দাওয়াত ছিলো সর্বজনীন।

২। রসুল বলা হয় আল্লাহর আইন কানুন, বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌছানোর জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তিকে। আর নবি বলা হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্ন অথবা ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে যার প্রতি বিশেষ ধরনের ওহি নাযিল করা হয়েছে, এরূপ মনোনীত ব্যক্তিকে।

৩। যাঁদের নিকট কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং নতুন শরিয়ত দেয়া হয়েছে তাদেরকে বলা হয় রসুল। আর যাঁদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়নি, পূর্ববর্তী রসুলগণের প্রচারিত শরিয়ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় নবি।

৪। প্রত্যেক রসুলই নবি কিন্তু প্রত্যেক নবিই রসুল নন।

নবি ও রসুলের অভিন্ন মূলনীতি এবং তাঁদের স্বীকৃতি

নবি ও রসুলগণের মূলনীতি অভিন্ন। সকল নবি ও রসুল তাওহিদ, রিসালত ও আখেরাতের উপর ইমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। সর্বপ্রথম নবি হযরত আদম (ﷺ) এবং সর্বশেষ নবি ও রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত কমপক্ষে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবি রসুল সকলই যে সত্য, সকলের আনীত দীন যে সত্য ছিল, সকলেই যে মা'সুম ছিলেন, এ বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। তাদের উপর যে সকল কিতাব ও সহিফা নাযিল হয়েছে, এর সবগুলোই যে সত্য ছিল তা মেনে নেয়া ইমানের শর্ত।

প্রত্যেক নবি রসুলগণের আনীত কিতাবের ওপর ইমান আনা মুত্তাকিদের মৌলিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ : মুত্তাকি তারাই, যারা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের ওপর ইমান রাখে। (সুরা বাকারা, ৪)

নবি রসুলদের মধ্যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাদের প্রতি ইমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : রসুল তাঁর রবের পক্ষ হতে যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন। তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তাঁরা আরও বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সুরা বাকারা, ২৮৫)

এ কথা বিশ্বাসে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, হযরত আদম (ﷺ) থেকে রসূলে আকরাম (ﷺ) পর্যন্ত সকল নবি রসুলের দীন তথা জীবনব্যবস্থা ছিল ইসলাম। যখনই কোনো জনগোষ্ঠী ইসলামের মূলনীতি থেকে বাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা নবি রসুল প্রেরণ করে তাদেরকে আবার সঠিক দীনের পথে আনার ব্যবস্থা করেছেন।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি তা'যিম ও মহব্বত

আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলিকে তা'যিম বা সম্মান দেখানোর আদেশ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থ : আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে তা হবে তাঁর অন্তরের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। (সুরা হজ, ৩২)

হজরত ওমর (ﷺ) প্রিয়নবি (ﷺ)-কে বলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآنَ يَا عُمَرُ»

অর্থ : হে আল্লাহর রসুল, (ﷺ) আমি আপনাকে আমার প্রাণ ছাড়া আর সবকিছু থেকে অধিক মুহাব্বত করি। নবি করিম (ﷺ) বলেন, 'না, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হবো (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইমানদার হবে না)।' অতঃপর হজরত ওমর (ﷺ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।' রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হে ওমর! এখন তুমি ইমানদার হলে।' (সহিহ বুখারি)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ : তোমাদের কেউ ইমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে তার কাছে অধিক ভালোবাসার পাত্র হই। (সহিহ মুসলিম, ১/৪৯)

তাই, প্রিয়নবি (ﷺ) কে মহব্বত করা ইমান। তাঁকে সাধারণ বা আমাদের মতো মানুষ মনে করা, বড়ো ভাইয়ের মতো মনে করা বা সাধারণ বার্তাবাহক দূত মনে করা তাঁর শানের খেলাফ হওয়ায় এ সকল আকিদা কুফরি। প্রিয় নবি (ﷺ) নিজেই বলেছেন–

اَلَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ

অর্থ : জেনে রাখ, যার মহব্বত নেই তার ইমান নেই।

প্রিয়নবি (ﷺ) এর মহব্বত সৃষ্টির উপায় হলো–

১। বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পেশ করা।

২। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা।

৩। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আহলে বাইত, আওলাদ, সহধর্মিণীগণ, তাঁর প্রতি আশেক আল্লাহর অলিগণকে ভক্তি ও মহব্বত করা।

৪। প্রিয় নবি (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা।

নবি (ﷺ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম

দরুদ শরিফ (اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মহান আল্লাহ নিজে যে কাজটি করেন, ফেরেশতাগণ সদা-সর্বদা যে দরুদে মশগুল থাকেন, মুমিনদেরকে এ কাজ করার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। দরুদ পাঠ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ : নিশ্চই আল্লাহ তাঁর নবির উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহর নবির শান ও মান বর্ণনা করছেন। হে মুমিনগণ! তাঁর উপর তোমরা দরুদ পাঠাও এবং (তা'জিম ও ভক্তির সাথে) সালাম দাও। (সুরা আহযাব, ৫৬)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) বলেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

অর্থ : যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার উপর সত্তরটি রহমত বর্ষণ করবেন এবং ফেরেশতারা সত্তরবার ঐ পাঠকের মাগফিরাত কামনা করবেন। যে বান্দা চাইবে এই ফজিলতপূর্ণ কর্ম কম করবে অথবা যে চাইবে বেশি করবে (এটা তার বিষয়)।

(মুসনদে আহমদ, ২/১৭২)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর উপর দরুদ না পড়া পর্যন্ত সকল দোআ প্রত্যাখ্যাত থাকে (কবুল হয় না)।

(তাবারানি ও আওসাত)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়া ভুলে যায়, সে জান্নাতের পথ ভুলে যায়।

(ফয়যুল কাদের-২/১২৭, নাদরুতুন নাঈম-১/৫৭০)

প্রিয় নবি (ﷺ) এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

রসুল (ﷺ) এর আগমনের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা রসুলে আকরাম (ﷺ) কে رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (রহমাতুললিল আলামিন) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

মহানবি (ﷺ) কে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থ : হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শক ও আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি। (সুরা আহযাব, ৪৫-৪৬)

এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী রসুলে আকরাম (ﷺ) সাক্ষ্য দেবেন হক ও বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার। দীন পালনকারী ইমানদার লোকদের জন্য তিনি পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেবেন আর বেইমান ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাবেন। তাঁর আহ্বান থাকবে আল্লাহর দিকে। তিনি হবেন চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী দেদীপ্যমান সূর্যের মতো। অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের সব অন্ধকার তাঁর ওসিলায় দূর হয়ে যাবে। তিনি মানবতার জন্য নুর বা আলো। আলোতে যেভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন হবে আলোকিত, তদ্রুপ অন্তর হবে নুরে ঝলমল। কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন।

প্রিয়নবি (ﷺ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রধান চারটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলি তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও তারা পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। (সুরা আলে ইমরান, ১৬৪)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন তবে, আমাদের মতো নন

হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) একজন মহামানব এটাই মহাসত্য। তিনি কোনো ফেরেশতা বা জিন ছিলেন না। মানুষের মর্যাদা ফেরেশতা বা জিন থেকে অনেক উর্ধ্বে। তবে তিনি অতুলনীয় মহামানব। আল্লাহ তাআলা যেমনই স্রষ্টা হিসেবে অনন্য তেমনি মহানবি (ﷺ) সৃষ্টি জীবের মধ্যে অনন্য। কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা শিরক; যা মারাত্মক জুলুম। আবার কোনো সৃষ্টিকে রসুল (ﷺ)-এর সাথে তুলনা করার অর্থ হলো তাঁর মান ও মর্যাদাকে খাটো করা। এ জন্যই বলা হয়–

إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ

অর্থ : রসুল (ﷺ) কে তুচ্ছ করা, যা সর্বসম্মতভাবে কুফরি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (ﷺ) কে নিজে বাশার বলেননি বরং তার হাবিবকে বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় দিতে বলেছেন এভাবে–

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থ : বলুন হে নবি! আমি তোমাদের মতো একজন মানুষই, তবে আমার উপর ওহি অবতীর্ণ হয়। নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহ মাবুদ একজনই। (সুরা কাহাফ, ১১০)

যারা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে না করে অন্য কোনো সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এ আয়াতে তাদের সঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে রসুলগণ মানব জাতি থেকেই প্রেরিত হয়েছেন। পূর্ববর্তী অনেক জাতি আল্লাহর সাথে শিরক করে ধ্বংস হয়েছে। তাই মুসলমানদের শিরকযুক্ত আকিদা থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

আবার যুগে যুগে নবি রসুলগণকে তাদের সৃষ্টি ও গুণগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে সমাজের বড়ো লোক, মোড়লসহ অহংকারীরা তাঁদেরকে সাধারণ মানুষই শুধু মনে করেনি বরং তাদেরকে আরো হীন তুচ্ছ মনে করে বলতো–

إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

অর্থ : এটাতো বাশার বা সাধারণ মানুষের কথা।

اَ بَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ

অর্থ : সে কী! আমাদের মতো মানুষ যে, তাকে আমরা অনুসরণ করবো?

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থ : রসুল (ﷺ) আমাদেরই মতো মানুষ।

এসব কথাই ছিলো কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে তুচ্ছ করার গালি স্বরূপ। ইমাম রাগিব বলেন–

لَمَّا اَرَادَ الْكُفَّارُ الْغَضَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اِعْتَبَرُوْا ذٰلِكَ.

অর্থ : কাফিররা যখন নবিদের শান-মানকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করতো তখনই بَشَرٌ পরিভাষাটি ব্যবহার করতো।

আল্লাহ্ তাআলা এজন্যই তার প্রিয় নবি (ﷺ) কে জানিয়ে দিতে বলেছেন, আমি তোমাদের মতো মানুষ। তবে পার্থক্য আমি সাধারণ মানুষ নই; আমার উপর ওহি অবতীর্ণ হয়।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুলল্লিল আলামিন (ﷺ) কে সাধারণ মানুষ মনে করে যদি তার আনুগত্য করা হয়, তা হবে তাঁর মর্যাদা ও শানের খেলাফ। সাধারণ মানুষ মনে করা ছিলো কাফির মুশরিকদের আকিদা। কাফির নেতারা সাধারণ জনগণকে বলতো–

وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

অর্থ : আর যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুমিনুন, ৩৪)

অথচ রসুলে করিম (ﷺ) নিজেই বলেন-

أَيُّكُمْ مِّثْلِيْ ؟

অর্থ : তোমাদের কে আছো আমার মতো?

অন্য হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন-

لَكِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ .

অর্থ : কিন্তু আমি তোমাদের কারো মতো নই।

রসুলে করিম (ﷺ) এমন সত্তা, যার সামনে জোরে কথা বললে বা বেয়াদবি করলে জীবনের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। কুরআনের ভাষায়–

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।

(সুরা আল হুজুরাত, ২)

প্রিয়নবি (ﷺ) এর প্রতি সালাম

রসুলে পাক (ﷺ) এর প্রতি দরুদ বসে পড়া যায় এবং দাঁড়িয়েও পড়া যায়। তবে যখনই তাকে লক্ষ্য করে সরাসরি সালাম দেয়া হয়, তখন দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই আদব এবং মুস্তাহসান বা উত্তম কাজ। তাঁকে সালাম দেওয়া অতীব সওয়াবের কাজ। জীবনে একবার সালাম দেওয়া ফরজ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা কুরআনে سَلِّمُوْا শব্দটি, اَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তাঁকে সালাম দেওয়ার মাধ্যমে গুনাহমুক্ত হওয়া যায়। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) বলেন–

اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِـيِّ ﷺ اَمْحَقُ لِلذُّنُوْبِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلنَّارِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ.

অর্থ : নবি (ﷺ) এর উপর দরুদ পড়ার ফলে গুনাহ এমনভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়, যেভাবে ঠান্ডা পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। তার প্রতি সালাম পেশ করা দাস-দাসী মুক্ত করার চেয়ে উত্তম। (শিফা, কাজী আয়ায- ২/৬১)।

হজরত আবু হুরাইয়া (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِيْ شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ إِلَّا أَنَا وَمَلَائِكَةُ رَبِّيْ نَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থ : রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন- যে কোনো মুসলমান প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য থেকে আমার উপর সালাম পেশ করে, আমি এবং আমার পরওয়ারদেগারের ফেরেশতাকুল তার সালামের জবাব দেন। (জালাউল আফহাম, ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযী- ২৫)।

সালাত ও সালাম একজন মুমিনের ইমানকে বলিষ্ঠ করার সবচেয়ে বড়ো উপাদান। রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে চোখেদেখার বড়ো হাতিয়ার। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর রওজা মুবারকে গিয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া সুন্নত ও আদব।

রসুল (ﷺ) হায়াতুন্নবি

হায়াতুন্নবি (حَيَاةُ النَّبِيِّ) অর্থ নবির জীবন। পারিভাষিক অর্থে حَيَاةُ النَّبِيِّ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তেকাল পরবর্তী জীবন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রিয়নবি (ﷺ) এর জীবন আর অন্য মানুষের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর জীবন শুরু হয় সৃষ্টির সূচনাতে যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রকাশ পান ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে, ইন্তেকালের পরও আবার জীবন লাভ করেন। রওজা পাকে সশরীরে তিনি জীবিত আছেন– এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) জুময়ার দিনে বেশি পরিমাণ দরুদ শরিফ পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ

অর্থ : তোমরা জুমুয়ার দিনে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়বে। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (ﷺ), কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে প্রেরিত হবে? আপনি তো পচে যাবেন। জবাবে আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন নবিগণের দেহ স্পর্শ করতে। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ইবনু মাজাহ শরিফের বর্ণনা মতে–

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

অর্থ : আল্লাহ আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মুবারক ভক্ষণ করাকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এমনকি তাঁরা জীবিত অবস্থায় তথায় রিযিক পাচ্ছেন। (ইবনু মাজাহ-১১৯)

ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا دُفِنَ فِي قَبْرِهِ رَدَّ اللهُ رُوْحَهُ وَاسْتَمَرَّتِ الرُّوْحُ فِي جَسَدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَرُدَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) কে রওজা মোবারকে দাফন করার পর পরই আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ মোবারককে ফেরত দেন এবং রুহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সবসময় অবস্থান করতে থাকবে, যাতে তিনি তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশকারি উম্মতের জবাব দিতে পারেন। (সিফাউস সিকাম, আল্লামা সুবকি)

তাই আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রিয়নবি (ﷺ) রওজা পাকে সশরীরে জীবিত। তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিচ্ছেন।

খতমে নবুওয়াত

খতমে নবুওয়াত (خَتْمُ نَبُوَّةِ) বা প্রিয়নবি (ﷺ) কে শেষনবি হিসেবে মেনে নেওয়া ইসলামি আকিদার মৌলিক একটি বিষয়। যদি প্রিয়নবি (ﷺ) কে শেষনবি মানা না হয়, তাহলে কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামি শরিয়তের সবকিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। নতুন কাউকে নবি মানলে পূর্বের নবির কোনো কথা বা নির্দেশ মানার প্রয়োজন থাকে না। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন এবং প্রিয় নবি (ﷺ) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

অর্থ : মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোরই পিতা নন ; বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং নবিগণের সমাপ্তিকারী। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সুরা আহযাব, ৪০)

আয়াতে বর্ণিত خَتْمٌ শব্দের অর্থ তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত খতম বা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَىْ آخِرُهُمْ খাতামুন্নাবিয়্যিন অর্থ তাদের শেষ রসুল। (লিসানুল আরব- ৪/২০)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন– أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ

অর্থ : আমি শেষনবি, আমার পর আর কোনো নবি নেই। (মুসনদে আহমদ- দুররে মানসুর, ৬/৬১৭)

তাই যে বা যারা মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে শেষনবি মানবে না, তারা সমগ্র বিশ্বের ফকিহগণের রায় মোতাবেক অমুসলিম।

রসুল (ﷺ) এর শান ও মানকে হেয় করার পরিণাম

মহান আল্লাহ তাআলা যাঁর ওপর দরুদ পড়েন, ফেরেশতারা যাঁর শান ও মান বয়ানে সদা ব্যস্ত, নবি রসুলগণ যাঁর ভক্ত অনুরক্ত, পবিত্র কুরআনে যাঁর নাম ধরে আল্লাহ তাআলা একবারও ডাকেননি। সৃষ্টির সূচনা ও কেন্দ্রবিন্দু যিনি, যাঁর শান ও মানকে বুলন্দ করার জন্য এ সৃষ্টিজগত, তাঁর মান মর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে, অথবা কথা বা কাজে, ইশারা বা ইঙ্গিতে তাঁকে খাটো করা হয়, এমন কোনো কথা ও কাজ কুফুরির শামিল। তিনি আমাদের মতোই মানুষ, তাঁর মান মর্যাদা বড়ো ভাইয়ের চেয়ে অধিক নয়, তিনি পিয়নের মতো বার্তাবাহক মাত্র, তাঁর শান বেশি বললে শিরক হয়ে যাবে, তাকে ভক্তিভরে সালাম দিলে গুনাহ হবে, এসব আকিদা মুনাফিকদের।

যারা কথা ও কাজ দ্বারা প্রিয়নবি (ﷺ) কে কষ্ট দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন−

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সুরা আহযাব, ৫৭)

প্রিয়নবি(ﷺ)-এর দরবারে তাঁর কণ্ঠের আওয়াজের চেয়ে অন্য কোনো মানুষের কণ্ঠের আওয়াজ বড়ো হলে সে সামান্য বেআদবির জন্য সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন−

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ : তোমাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তাতে তোমরা টেরও পাবে না। (সুরা হুজুরাত, ২)

তাই এ কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাথে কাউকে তুলনা করা শিরক। আর প্রিয়নবি রসুল (ﷺ) এর সাথে বেয়াদবি করা কুফরি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الرسالة শব্দের অর্থ কী?

ক. দূত খ. চিঠি
গ. আনুগত্য ঘ. দাসত্ব

২. আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কতজন রাসুল প্রেরণ করেছেন?

ক. ৩১০ খ. ৩১১
গ. ৩১২ ঘ. ৩১৩

৩। نبي শব্দের অর্থ কী?

ক. শুভাগমন খ. শান্তিদাতা
গ. সংবাদদাতা ঘ. হুকুমদাতা

৪। رسول শব্দটি কুরআন মাজিদে কতবার এসেছে?

ক. ২৩৬ খ. ২৩৭

গ. ২৩৮ ঘ. ২৩৯

৫। نبي শব্দটি কুরআন মাজিদে কতবার এসেছে?

ক. ৫১ খ. ৫২

গ. ৫৩ ঘ. ৫৪

৬। سراج শব্দের অর্থ কী?

ক. নুর খ. প্রদীপ

গ. আলো ঘ. তারকা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। নবি ও রাসুলের পরিচয় দাও।

২। নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। নবি ও রাসুলের অভিন্ন মূলনীতি দলিলসহ আলোচনা কর।

৪। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি তাজিম ও মহব্বতের গুরুত্ব দলিলসহ আলোচনা কর।

৫। রাসুল (সা.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৬। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্যে আলোচনা কর।

৭। "রাসুলুল্লাহ (সা.) হায়াতুন্নবি" ব্যাখ্যা কর।

৮। খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে দলিলভিত্তিক আলোচনা কর।

৯। রাসূল (সা.) এর শান ও মানকে হেয় করার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

আহলে বাইতের প্রতি আকিদা

اَلْعَقِيْدَةُ حَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ

আহলে বাইতের পরিচয়

আহলে বাইত বলতে নবি পরিবারকে বোঝায়। আহলে বাইতকে মহব্বত করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইমানের অংশ। ইমানের সত্তরের অধিক শাখার মধ্যে একটি হলো–

حُبُّ آلِ الرَّسُوْلِ ﷺ বা রসুলের বংশধরকে ভালোবাসা।

আহলে বাইতের পরিচয় সম্পর্কে প্রিয়নবি (ﷺ) নিজেই বলেন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ﵃ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ ﵁ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) এর পালক সন্তান হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা (﵁) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত উম্মে সালমা (﵂) এর ঘরে অবস্থানকালীন যখন প্রিয়নবি (ﷺ) এর উপর এ আয়াত নাজিল হয়, 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে (সুরা আহযাব- ৩৩)।' তখন প্রিয়নবি (ﷺ) হজরত ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (﵃) কে ডেকে একটি কম্বলে আবৃত করে নিলেন। হযরত আলি (﵁) তখন তাঁর পশ্চাতে ছিলেন, তাঁকেও আবৃত করে নিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ ! এরা আমার আহলে বাইত। তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন আর তাঁদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখুন। (তিরমিযি-৫/৩৫১, মুসনাদু আহমদ-৬/২৯২)

এ হাদিস প্রমাণ করে প্রিয়নবি (ﷺ) এর আহলে বাইত ছিলেন পাক-পাঞ্জাতন বা পবিত্র পাঁচ অস্তিত্ব। আর তাঁরা হলেন প্রিয়নবি (ﷺ), হজরত আলি, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান, হজরত

হুসাইন (ﷺ)। প্রিয়নবি (ﷺ) এর স্ত্রীগণ, কতক সাহাবায়ে কেরাম হুজুরের পরিবারভুক্ত, তাঁরাও আহলে বাইতের অংশ। তাদের মর্যাদা অতুলনীয়।

পরবর্তী যুগে-যুগে জন্ম-গ্রহণকারী নবির বংশের লোকগণও সম্মানীয় ও বরণীয়। তাঁদেরকে **মহব্বত** করার তাকিদও হাদিসে এসেছে।

আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ) কে সম্মান করা ফরজ। তাঁর আহলে বাইতকে সম্মান করা, মহব্বত করা ইমানের অংশ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থ : হে নবি পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সুরা আহযাব, ৩৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন –

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ : বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে আমার নিকটাত্মীয়দের সৌহার্দ্য ব্যতীত আর কোনো প্রতিদান চাই না। (সুরা শুরা, ২৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন-

إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

অর্থ : নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার প্রাণের টুকরা। তাঁকে যে বস্তু কষ্ট দেয়, সে বস্তু আমাকেও কষ্ট দেয়। (সহিহ মুসলিম, ৭/১৪০)

হজরত আলি (ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

অর্থ : তুমি আমি হতে আর আমি তোমার হতে। (সহিহ বুখারি, ২/২১০)

হজরত হাসান ও হুসাইন (رضي الله عنهما) সম্পর্কে বলেন– اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি হাসান ও হুসাইনকে অন্তর দিয়ে মহব্বত করি। সুতরাং, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন। (তিরমিযি শরিফ)

এককথায় বলা যায়, প্রিয়নবি (ﷺ) এর আহলে বাইতকে সম্মান করা প্রিয়নবি (ﷺ) কেই সম্মান করার শামিল। আর তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া প্রিয়নবি (ﷺ) কেই কষ্ট দেওয়ার শামিল।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

খোলাফা (اَلْخُلَفَاءُ) শব্দটি خَلِيْفَةٌ শব্দের বহুবচন। خَلِيْفَةٌ শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী, পরে আগমনকারী, প্রতিনিধি।

দীনের মূলনীতিতে خِلَافَةٌ عَلٰى مَنْهَجِ النُّبُوَّةِ 'নবুওয়াতী ধারার খেলাফত' একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা প্রিয় নবি (ﷺ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নবুওয়াতী ধারার নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদা বা খলিফাতুল মুসলিমীন বলা হয়।

প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ

অর্থ : আমার পরে কোনো নবি নেই, তবে আমার পরে অনেক খলিফা হবে। (রিয়াদুস সালেহিন, ২৯৮)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থ : তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

এ হাদিসে খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজনকে বোঝায়। তারা হলেন–

১. সিদ্দিকে আকবার আবু বকর (رضي الله عنه)

২. ফারুকে আযম ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه)

৩. ওসমান যুন্নুরাইন (رضي الله عنه)

৪. আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব (رضي الله عنه)।

এ তাঁদের সবাই ছিলেন জ্ঞানে-গুণে, বিচক্ষণতায়, বদান্যতায়, পরহেযগারি, আল্লাহ ও রসুল প্রেমে, প্রশাসনিক যোগ্যতায় প্রিয়নবি (ﷺ) এর পরেই সেরা মানুষ। যাঁদেরকে **মহব্বত** করা ইমানের অঙ্গ। তাঁদের সবাই ছিলেন مُبَشَّرَةٌ بِالْجَنَّةِ বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। ইমানের দৃঢ়তায় নেক আমলের প্রাচুর্য, দীনের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ, রাসুলে পাক (ﷺ) এর অনুসরণে তাদের জুড়ি নেই। তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, তাঁদের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করা, তাদের আদর্শ অনুসরণ করা ইমানের দাবি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. আহলে বাইত বলতে কাদেরকে বোঝায়?

ক. মুহাজির খ. আনসার

গ. নবি পরিবার ঘ. খোলাফোয়ে রাশেদীন

২. রাসুল (ﷺ)-এর প্রাণের টুকরা কে?

ক. হযরত আলি (رضي الله عنه)

খ. হযরত ফাতেমা (رضي الله عنها)

গ. ইমাম হাসান (رضي الله عنه)

ঘ. ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه)

৩. আহলে বাইতকে মহব্বত করা কীসের অংশ?

ক. ইসলামের খ. ইমানের

গ. ভালবাসার ঘ. ইহসানের

৪। خَلِيفَة শব্দের বহুবচন কী?

ক. خلفاء খ. خلاف

গ. أخلفة ঘ. خلافة

৫। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে সম্মান করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। আহলে বাইতের পরিচয় দাও।

২। আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইমানের অংশ দলিলসহ লেখ।

৩। আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে কুরআন মাজিদের একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

৪। খোলাফায়ে রাশেদার মর্যাদা আলোচনা কর।

৫। খোলাফায়ে রাশেদা কত জন ও কে কে? লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

আল ইমান বিল কুতুব

اَلْإِيْمَانُ بِالْكُتُبِ

আসমানি কিতাবের ওপর ইমান আনার গুরুত্ব

ইসলামি পরিভাষায় কিতাব বলতে এমন গ্রন্থকে বোঝায়, যা মানবজাতির হিদায়াত তথা পথ নির্দেশনার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি রসুলগণের প্রতি যুগে-যুগে অবতরণ করা হয়েছে। সকল আসমানি গ্রন্থের উপর ইমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি এবং তিনি তার রসুলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তার পূর্বে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এসবের প্রতি ইমান স্থাপন কর। (সুরা নিসা, ১৩৬)

আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা মুত্তাকি হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ : আর যারা ইমান আনে আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি। (সুরা বাকারা, ৪)।

অতীতের আসমানি কিতাবসমূহ সবই সত্য। তবে যুগে যুগে এগুলো বিকৃত হওয়ায় সেগুলোর কোনো নির্দেশনা পালন করা আমাদের উপর ফরজ নয়।

আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত আসমানি কিতাবসমূহ ছিলো সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের জন্য মহাসত্যের আলোক উজ্জ্বল দিশারি। এ সকল কিতাবে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। আহলুস সুন্নতের আকিদা হলো, নবিগণের প্রতি সকল গ্রন্থই ছিলো সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারি। আসমানি কিতাবসমূহ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান।

আল কুরআনের মুজিযা

মানুষ ও জিন জাতির হিদায়াতের জন্য নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম। প্রত্যেক মুসলমানের ইমান হলো, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ অবিকৃত কিতাব। এ কিতাবের একটি বর্ণ বা যের, যবর, হরকতও পরিবর্তীত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে না। কারণ এ কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

অর্থ : আমি স্বয়ং কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর হিফাযতকারী। (সুরা হিজর, ৯)

আল-কুরআন যে অলৌকিক, তুলনাহীন, সন্দেহমুক্ত আল্লাহর বাণী তদ্বিষয়ে উক্ত কিতাবের শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে–

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : এই কিতাবে সন্দেহের অবকাশ নেই। (সুরা বাকারা, ২)।

আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির সামনে কুরআনের অলৌকিকতা সর্ম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ইরশাদ করেন–

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

অর্থ : আপনি বলে দিন– যদি সকল মানুষ ও জিন এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করে আনবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনই এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না। (সুরা বনি ইসরাইল, ৮৮)

আল কুরআনের অলৌকিকতার অসংখ্য দিক রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১। কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলেও এর উপস্থাপনা, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য-বিন্যাস গদ্য নয় এবং পদ্যও নয়; নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক ও কবিগণ এ কিতাবের মতো কিতাব তো দূরে থাক এ কিতাবের একটি আয়াতের মতো একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

২। বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ বিশ্বের সকল গদ্য ও পদ্য রচনার উর্ধ্বে।

৩। কুরআন অতীত যুগের এমন সব ঘটনার অবতারণা করেছে, যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কুরআন এমন সব ভবিষ্যৎবাণী করেছে, যা কোনো মানুষ কল্পনায়ও আনতে সক্ষম নয়।

৫। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন বিশ্বকোষ, কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল গবেষক গবেষণা চালালেও তার গূঢ়রহস্য পূর্ণভাবে উদঘাটন করা সম্ভব হবে না।

৬। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকদিশারি এই কুরআন। বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হবে এ কুরআন তত আধুনিক গ্রন্থ হিসেবে বিকশিত হবে।

৭। সমগ্র মানবতার জন্য হিদায়াত বা পথ নির্দেশক هُدًى لِّلنَّاسِ বলা হয়েছে কুরআনকে। মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, স্থান, কাল, পাত্র, যুগ-যামানার পরিবেশ, পরিস্থিতি সকল পর্যায়ে কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা মানব রচিত কোনো আইন ও বিধানে সম্ভব নয়।

আল কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস

মানুষ ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল শাখার জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বকোষ। এ কুরআন সন্দেহাতীত। শুরুতেই আল্লাহ বলেন–

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

অর্থ : এ কিতাবে সন্দেহের অবকাশ নেই। (সুরা বাকারা, ২)

পার্থিব ও পারলৌকিক এমন কোনো জ্ঞান নেই, যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। এ জন্য আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত।

(সুরা আল ফুরকান- ৮৯)

অতীতে মুসলিম জাতির উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার পেছনে চালিকাশক্তি ছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আর প্রিয় নবি (ﷺ) এর প্রতি তা'যিম ও মুহাব্বত।

আল্লামা ইকবাল তাই বলেছিলেন–

وہ زمانہ میں معزز تھے حامل قران ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

'কুরআনের ধারক হয়েই সে যুগ করতো গর্ববোধ

কুরআন ছেড়ে এখন হয়েছ যুগ কলঙ্ক, হায় অবোধ।'

বস্তুত সন্দেহমুক্ত, নির্ভেজাল, সর্বাধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সুদক্ষ হতে, প্রযুক্তি ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন করতে এবং বিশ্বনেতৃত্ব করায়ত্ব করতে এ কুরআনই আমাদের একমাত্র দিশারি, যার কোনো বিকল্প নেই।

আল কুরআন সঠিক পথের নির্দেশক

আল কুরআন আল্লাহর কালাম। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের পথ নির্দেশক এ কুরআন। আল্লাহ তাআলা নিজেই এ কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ ، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে নুর (জ্যোতি) তথা মুহাম্মদ (ﷺ) এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন লোকদের শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তিনি নিজ দায়িত্বে তাদেরকে (কুফর ও শিরকের) অন্ধকার থেকে (ইমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল সহজ পথ প্রদর্শন করেন। (সুরা মায়েদা, ১৫-১৬)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সে দুটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হলো : আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নত।

(মুআত্তা- ইমাম মালিক)

সমগ্র জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধান রয়েছে আল-কুরআনে।

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন−

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

অর্থ : তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (সুরা আরাফ, ৩)

কুরআনই হবে মুসলমানদের আইন ও সংবিধানের মূলমন্ত্র। এটাই আল কুরআনের বিশ্বাস ও ইমানের দাবি। এর মাধ্যমেই রয়েছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি।

কুরআনকে বিদ্রুপ করার পরিণাম

কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকু বিশ্বাস করাই ইমান। কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন, তার জ্ঞান অর্জন, তার আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। এ ফরজকে অস্বীকারকারী বা বিদ্রুপকারী ইমানদার হতে পারে না। কুরআনের কিছু অংশ মেনে আমল করা কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন −

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

(সুরা বাকারা, ৮৫)

কুরআনের নির্দেশ না মানা কবিরা গুনাহ। কিন্তু কুরআনকে বিদ্রুপ করা কুফুরী, যার শাস্তি জাহান্নাম।

বুঝার জন্য কুরআন অবতরণ

কুরআন এসেছে হেদায়েতের জন্য, হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণের জন্য। কুরআনের এক নাম ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ) বা পার্থক্যকারী। কুরআন এসেছে (حَيَاةً طَيِّبَةً) পবিত্র, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সুন্দর ও সুখময় জীবন উপহার দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন−

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

অর্থ : নারী বা পুরুষ ইমানদার যদি যথাযথভাবে নেককাজ সম্পাদন করে, আমি অবশ্যই অবশ্যই তাকে পবিত্র, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল জীবন দান করবো। (সুরা আন নাহল, ৯৭)

এ সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক জীবন লাভের জন্য পথ নির্দেশক কুরআনকে জানতে, অনুসরণ করে দুনিয়াবি জীবনে বাস্তব আমলে পরিণত করতে হবে। তাই প্রথমে কুরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত শিখতে হবে। এরপর তার শাব্দিক অনুবাদ, পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং প্রতিটি আয়াতের বক্তব্য বুঝেশুনে বাস্তবায়ন করতে হবে। যা মানা ফরজ তা জানাও ফরজ। তাই কুরআনকে তা'যিম-সম্মান করা যেভাবে ফরজ, তা জানা ও বোঝাও সমানভাবে ফরজ। কুরআনকে ভক্তি করে যদি তা না বুঝে তার থেকে হেদায়েত গ্রহণ করতে না পারে তাহলে জীবনে উন্নতি-সমৃদ্ধি অসম্ভব। তাই, কুরআন যেভাবে তেলাওয়াত করতে হবে অনুরূপভাবে তা বুঝে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনা কী হওয়ার জন্য শর্ত?

ক. মুত্তাকি খ. মুমিন

গ. আবেদ ঘ. বেহেশতি

২. সমগ্র মানবতার জন্য পথপ্রদর্শক কোন কিতাব?

ক. তাওরাত খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

৩. কুরআনের মুজিযা কী?

ক. এর ভাষা গদ্য ও পদ্য রচনার উর্ধ্বে খ. এটি সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত হয়

গ. এটি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সূতিকাগার ঘ. সবগুলো

৪. নিচের কোন দুটি বিষয় আঁকড়ে ধরলে মুসলমানরা পথভ্রষ্ট হবে না?

ক. কুরআন-সুন্নাত খ. কুরআন-কিয়াস

গ. কুরআন-ইজমা ঘ. ইজমা-কিয়াস

৫. **কুরআন মাজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার হুকুম কী?**

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬. **اَلْفُرْقَانُ অর্থ কী?**

ক. পার্থক্যকারী খ. হেদায়েত দানকারী

গ. পথপ্রদর্শক ঘ. বর্ণনাকারী

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. কুরআন মাজিদের মুজিযাসমূহ লেখ।

৩. দলিলসহ বর্ণনা কর যে, "আল-কুরআন সঠিক পথের নির্দেশক"।

৪. কুরআন মাজিদ বুঝার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫. কুরআন মাজিদকে বিদ্রুপ করার পরিণাম বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল ইমান বিল আখেরাত

اَلْإِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ

আখেরাতের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব

আখেরাত (اَلْاٰخِرَةُ) শব্দের অর্থ সর্বশেষ, সকলের পর, পরকাল ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন। ইসলামি পরিভাষায় আখেরাত বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের অফুরন্ত সময়কে বোঝায়।

কবরে অবস্থান, মুনকার-নকিরের সওয়াল-জবাব, মুমিনগণের জন্য বেহেশতের আরাম-আয়েশ, কাফির ও গুনাহগারের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, কিয়ামত, সিঙ্গায় ফুৎকার, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া, পঞ্চাশ হাজার বছর হাশরের ময়দানে অবস্থান, হিসাব-নিকাশ, হাউযে কাউসারের পানি পান করা, আল্লাহ্ তাআলার আরশে আযিমের নিচে ছায়ায় অবস্থান, পুলসিরাত অতিক্রম করা, জান্নাত-জাহান্নাম, শাফাআত, জান্নাতবাসিগণের সাথে আল্লাহ্ তাআলার দিদার এসব বিশ্বাস করাই হলো ইমান বিল আখেরাত।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে আখেরাতের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে–

১। মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, এর নাম দেয়া হয়েছে বরযাখ (بَرْزَخٌ) বা কবরের জীবন। মৃত্যুর পর থেকে হাশর মাঠে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালই বরযাখ বলে। চাই মরদেহকে মাটিতে কবর দিয়ে রাখা হোক, কিংবা আগুনে-পানিতে সে দেহ ধ্বংস হয়ে যাক বা জন্তু-জানোয়ার তা খেয়ে হজম করে ফেলুক, সর্বাবস্থাই বরযাখি অবস্থা।

২। হাশর থেকে অনন্তকাল অবধি অবস্থান সেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই। কিয়ামত বলতে এমন এক সময়কে বোঝায়, যখন আল্লাহর নির্দেশে জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছু জীবিত হবে। হাশর-নশর, হিসাব-কিতাবের পর যারা উত্তীর্ণ হবেন তারা জান্নাতে যাবেন, আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আখেরাতের প্রতি ইমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা কাফির। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

অর্থ : যে কেউ আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসুলগণ এবং আখেরাতকে অস্বীকার করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সুরা নিসা, ১৩৬)।

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস ও অনুসরণ যথার্থ রাখার প্রয়োজনেও আখেরাতের প্রতি ইমান একান্ত আবশ্যক। আখেরাতের প্রতি ইমান, মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য ও অসত্যের প্রতি বিরাগ জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে–

إِلٰهُكُمْ إِلٰـهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের ইলাহ একজনই। তাই যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। (সুরা নাহল, ২২)

এক কথায় বলা যায়, আখেরাতের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না।

আখেরাতে নবি (ﷺ) এর শাফাআত

শাফাআত (شَفَاعَةٌ) শব্দের অর্থ সুপারিশ, মধ্যস্থতা। ইমাম রাগেব বলেন–

اَلشَّفْعُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلٰى مِثْلِهِ

অর্থ : কোনো বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর সাথে মিলানো।

শরিয়তের পরিভাষায় শাফাআত হলো– اَلْإِنْضِمَامُ إِلٰى آخَرِ نَاصِرًا لَـهُ

অর্থ : সাহায্যের উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে অন্যের দারস্থ হওয়া।

ইমাম জুরজানী বলেন, শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শাস্তিদাতার কাছে আবেদন জানানোকে শাফাআত বলে। (নুদরা -৬/২৩৬৬)

নবিগণের শাফাআত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবিরা গুনাহকারীগণের জন্য পাপের কারণে যাদের শাস্তি অনিবার্য, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন আমাদের প্রিয়নবি (ﷺ) শাফাআত করবেন।

(ইমাম আযম (رحمه الله), আল ফিক্‌হুল আকবর)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

অর্থ : দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন তিনি ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। (সুরা তহা, ১০৯)

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে আদেশ দেবেন বা যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ

অর্থ : আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য আমার শাফাআত অবধারিত।

(তিরমিযি ও মিশকাত)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا وَأُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ فِي الْآخِرَةِ

অর্থ: প্রত্যেক নবির জন্য একটি গ্রহণকৃত দোআ রয়েছে, যে দোআটি তিনি করতে পারেন। আমি আশা করি আমার দোআটি আখেরাতে আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য নির্ধারিত করে রাখব।

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

তাই কেয়ামতের দিন গুনাহগার উম্মতের জন্য প্রিয়নবি (ﷺ) এর শাফাআত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

হাশরের ময়দানে অবস্থান ও ভালো-মন্দের বিচার

হাশর (اَلْحَشْرُ) শব্দের অর্থ সমাবেশ, ভিড়। ইয়াওমুল হাশর (يَوْمُ الْحَشْرِ) অর্থ সমাবেশ দিবস, কিয়ামতের দিন। এ সৃষ্টিজগতে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, গ্রহ-নক্ষত্র খসে পড়বে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে একটা ময়দান তৈরি হবে, সেখানে সকল মানুষ ও জিনদেরকে হাজির করা হবে। এ ময়দানে হাজির হতেই হবে এ আকিদা এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখার কথা কুরআনে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অর্থ : মুমিনরা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা, ৪)

হাশরের ময়দানে যে পঞ্চাশ হাজার বছর অবস্থান করতে হবে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থ : ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছর। (সুরা মায়ারেজ, ৪)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفاً مُشَاةً وَصِنْفاً رُكْبَاناً وَصِنْفاً عَلَى وُجُوْهِهِمْ

অর্থ : কেয়ামতের দিন মানুষ তিন শ্রেণিতে হাশরের ময়দানে হাজির হবে। একদল পায়ে হেঁটে, আরেকদল সওয়ারিতে আরোহণ করে এবং তৃতীয় দল মাথার উপর ভর করে (মাথা নিচে আর পা উপরে করে) হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখতে হবে। হাশরের ময়দানে ভালো-মন্দের বিচার হবে। মানুষের আমলনামা পরিমাপ করা হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

অর্থ : আর কেয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং, কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (সুরা আম্বিয়া- ৪৭)

এমন মুহূর্ত আসবে সে দিন পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু, মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র কেউই কারো পরিচয় দেবে না। নবিগণ সেজদায় পড়ে কাঁদতে থাকবেন। সেদিন যেন বিচারে শাস্তি পেতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থেকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর ভয়, প্রিয় নবি (ﷺ) এর প্রতি মুহাব্বত রেখে সহিহ্ আকিদা ও নেক আমলই বিচারের দিন নাজাতের ওসিলা হবে।

জান্নাতের পরিচয়

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ) শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান। ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলে। জান্নাতে আছে আরামের সবরকম ব্যবস্থা। মন যা চাইবে, সেখানে তাই পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

অর্থ : জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে, তোমরা যা দাবি করবে তাই তোমাদের দেওয়া হবে।
(সুরা হামীম আস সাজদাহ, ৩১)

জান্নাতে অনেক সুখ শান্তি রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি। যারা তাদের প্রভুর সামনে হিসাব-নিকাশে দাঁড়াতে ভয় করে কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, তাদের ঠিকানা জান্নাত।

জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ) সবচেয়ে মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

অর্থ : নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। (সূরা কাহাফ, ১০৭)

জান্নাত লাভের পথ

জান্নাত লাভের উপায় কী? জান্নাতের অবস্থা কেমন হবে? কারা জান্নাতে অবস্থান করবেন, এসব প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ১৩৮ টি আয়াতে আলোচনা করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম যে সত্য এবং বর্তমানে তার অস্তিত্ব রয়েছে–এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কারা জান্নাতবাসি হবেন–এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ.

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই জান্নাতবাসী। (সুরা বাকারা- ৮২)

জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে রব স্বীকার করা, আর সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ। এ আকিদা ও বিশ্বাস মনে প্রাণে ধারণ করা, রসুল (ﷺ) একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য ও মুহাব্বত মনে-প্রাণে চির জাগরুক রেখে নেক আমল করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানো।

জাহান্নামের ভয়

দোযখের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা আযাব হিসেবে আগুন বা اَلنَّارُ শব্দটি ১২৬ বার উল্লেখ করেছেন। জাহান্নামীদের সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থ : যারা কুফরি করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (সুরা বাকারা, ৩৯)

সুরা হজে জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُبِه مَافِيْ بُطُوْنِهِمُ الْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

অর্থ : যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলে যাবে এবং তাদের জন্য রয়েছে লোহার গোর্জসমূহ। যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ঠেলে দেওয়া হবে এবং বলা হবে; আস্বাদন করতে থাক দহন যন্ত্রণা।

(সুরা হজ, ১৯-২২)

জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহ অবস্থা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّى اسْوَدَّتْ فَهُوَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন : দোযখের আগুনকে হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা লাল হয়ে গেছে। ঐ লাল আগুনকে হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা সাদা হয়ে গেছে। ঐ সাদা আগুনকে আবার হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা কালো হয়ে গেছে। বর্তমানে দোযখের আগুন গহিন কালো এবং অন্ধকার। (তিরমিযি ও মিশকাত)

প্রিয়নবি (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

জাহান্নামবাসীদের পান করার জন্য যে পুঁজ দেয়া হবে তার এক বালতি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে গোটা দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে মারা যাবে। (মিশকাত, ২/৫০৩)।

রসুলে আকরাম (ﷺ) হজরত মুসলিম আত তামিমী (رضي الله عنه) কে বলেন–

اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَالِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَالِكَ فَاِنَّكَ اِذَا مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا.

অর্থ : মাগরিবের সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কারো সঙ্গে কথা বলার পূর্বে তুমি ৭ বার পড়বে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ (হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও)। তুমি এ দোআ পড়ে যদি সে রাতে মারাও যাও তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি অবধারিত হয়ে যাবে। সকাল বেলা ফজর সালাতের পর যদি অনুরূপভাবে এ দোআ পড় সেদিন যদি মারা যাও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (আবু দাউদ শরিফ ও মিশকাত)।

সহিহ ইমান ও নেক আমল করার সাথে সাথে সকাল সন্ধ্যা এ দোআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে নাজাত চাইতে হবে।

পরকালে নবি, শহিদ, ওলি ও আলেমগণের সুপারিশ

কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় যাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, তাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলারই অনুমতিক্রমে নবি, শহিদ, ওলি ও আলেমগণ সুপারিশ করবেন। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অর্থ : কেয়ামত দিবসে তিন শ্রেণির লোক সুপারিশ করবেন– নবিগণ, আলেমগণ ও শহিদগণ। (মিশকাত)

শহিদগণ তাঁর নিকটাত্মীয় সত্তরজন ব্যক্তি যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ শহিদের সম্মানে তাদেরকে মুক্তি দেবেন। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ

অর্থ : তাঁর নিকটাত্মীয় সত্তরজনের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। (মুসনদে আহমদ, ৪/১৩১; তিরমিযি, ১৬৬৩)

সুপারিশ করতে পারেন এমন শহিদ ও আলেম যদি তৈরি হয়, তাহলে তা হবে ঐ বংশের জন্য গৌরবের বিষয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الْآخِرَةُ অর্থ কী?

ক. উত্তম স্থান
খ. পরকাল
গ. সমাবেশ
ঘ. পুনরুত্থান

২. সবচেয়ে মর্যাদাবান জান্নাত কোনটি?

ক. দারুস সালাম খ. দারুল কারার

গ. দারুল মাকাম ঘ. জান্নাতুল ফেরদাউস

৩. হাশরের ময়দানে কত বছর অবস্থান করতে হবে?

ক. ৫০ বছর খ. ৫০ হাজার বছর

গ. ৫০০ বছর ঘ. ৫০০০ বছর

৪. নিচের কোন বিষয়টি আখেরাতের প্রতি ইমানের অংশ নয়?

ক. কবরে অবস্থান খ. পুনরুত্থান

গ. জান্নাত-জাহান্নাম ঘ. বায়তুল্লাহ

৫. কেয়ামত দিবসে কয় শ্রেণির মানুষ সুপারিশ করবেন?

ক. ৪ খ. ৫

গ. ৩ ঘ. ৬

৬. শহিদগণ কত জনের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন?

ক. ৬০ খ. ৭০

গ. ৮০ ঘ. ৫০

৭. النار (আগুন) শব্দটি আল-কুরআনে কতবার উল্লিখিত হয়েছে?

ক. ১২০ খ. ১২২

গ. ১২১ ঘ. ১২৬

৮. الجنة (জান্নাত) শব্দের অর্থ কী?

ক. মুখ খ. শান্তি

গ. আরাম ঘ. উদ্যান

৯. জান্নাতের বিষয়ে কুরআন মাজিদে কতটি আয়াতে আলোচনা হয়েছে?

ক. ১৩০ খ. ১৩৬

গ. ১৩৮ ঘ. ১৪০

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. আখেরাতের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. শাফাআত কাকে বলে? পরকালে রাসুল (সা.)-এর শাফাআতের বিষয়টি দলিলসহ লেখ।

৩. হাশরের ময়দানে ভালো-মন্দের বিচারের বিষয়টি দলিলসহ বর্ণনা কর।

৪. জান্নাতের পরিচয় দাও।

৫. জান্নাত লাভের পথ বর্ণনা কর।

৬. জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দাও।

সপ্তম অধ্যায়

আল ঈমান বিল কাদর

(اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ)

তকদিরের পরিচিতি

তকদির (تَقْدِيْرٌ) শব্দটি بَابُ تَفْعِيْلٍ-এর مَصْدَرٌ। এ শব্দটি قَدَرٌ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। قَدَرٌ শব্দের অর্থ تَبْيِيْنُ كَمِّيَّةِ الشَّيْئِ তথা কোনো বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

(মুফরাদাত, ৩৯৬)

পারিভাষিক অর্থে তকদির হলো–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَّقُبْحٍ وَّنَفْعٍ وَّضَرَرٍ وَّمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ وَّمَايَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَّعِقَابٍ.

অর্থ: তকদির হলো প্রতিটি বস্তুর যথোপযুক্ত পরিমিতি তথা সুন্দর-অসুন্দর, উপকার-অপকার এবং তাকে পরিবেষ্টনকারী সময় ও স্থান এবং তজ্জন্য প্রাপ্ত পুরস্কার ও শাস্তি পূর্ব হতে নির্ধারিত থাকা।

(শারহু আকাইদিন নাসাফিয়্যা, ৮২)

তকদিরের তাৎপর্য

তকদিরের উপর বিশ্বাস ইসলামের মৌল আকিদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতি ইমান আনা যেমন ফরজ, তেমনি তকদিরের উপর ইমান আনাও ফরজ।

(শরহু ফিকহিল আকবার)

আল্লাহ্ তাআলা নিজেই সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى

অর্থ : তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তিনি তকদির নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। (সুরা আলা, ২-৩)।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

অর্থ : তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে যথার্থ অনুপাতে পরিমিত করেছেন।

(সুরা ফুরকান, ২)

প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারণ করার অর্থ হলো, সৃষ্টি জগতের মধ্যে কার কী আকৃতি, কার কী প্রকৃতি, কার কী কর্ম, কার কী দায়িত্ব, কার কী গুণাগুণ, কার কী বৈশিষ্ট্য হবে, কার জন্য মৃত্যু কখন কোথায় কীভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়ের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা।

আল্লাহর عِلْمٌ বা জ্ঞান اَزَلِيٌّ বা শাশ্বত। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই অনাদি হতে অনন্ত কাল পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশ পাবে, সংঘটিত হবে, তা তিনি আগে থেকেই জানেন। এই জানার নামই তকদির। এর মধ্যে সৃষ্টির কোনো ইখতিয়ার নেই। মহান আল্লাহর এ নির্ধারণকে তকদির বলে। (আত তালীকুস সাবিহ ১/৬৮)।

মানুষের তকদির নির্ধারিত

মানুষের তকদির নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসের ন্যায় তকদিরের উপর বিশ্বাস করাও ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। তকদিরে ইমানের এমন একটি মৌলিক বিষয় যা ব্যতীত আল্লাহর উপর ইমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন–

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

অর্থ : আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে। (সুরা কামার, ৪৯)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَعِنْدَه مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ .

অর্থ : তাঁরই কাছে অদৃশ্যের চাবি; তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। তিনি জানেন যা কিছু আছে স্থল ও জলে। একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতসারে। কোনো শস্যকণা জমিনের অন্ধকারে অঙ্কুরিত হয় না, অথবা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্টরূপে কিতাবে নেই।

(সুরা আনআম, ৫৯)

রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهٗ اكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ : اُكْتُبْ مَقَادِيْرَكُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

অর্থ : সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ কলমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বললেন- লেখ। কলম বলল- হে পরওয়ারদিগার কী লিখব? আল্লাহ তাআলা বললেন- কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি হবে সব কিছুর তকদির লেখ। (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ইমানের মৌল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

اَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ.

অর্থ: তকদিরের ভালো-মন্দ সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অন্তর্ভুক্ত। (সহিহ বুখারি)

তকদিরকে অস্বীকার করা দীনকে অস্বীকার করার নামান্তর। হজরত উমর (رضي الله عنه) বলেন, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ.

অর্থ : তকদিরে অবিশ্বাসীদের সাথে উঠা-বসা করবে না, আর তাদের সাথে আলাপ-আলোচনাও হবে না। (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

একজন মানুষ নিজেকে ইমানদার হিসেবে পরিচয় দিতে হলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে আমার জীবনের সবকিছু আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত। এ বিশ্বাস মুমিনকে বহু দুর্বলতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং নৈতিকতা ও মননশক্তির উন্নতি সাধনে অভাবনীয় শক্তি যুগিয়ে দেয়।

মানুষের কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তবে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির অধীন। অথচ এ অসম্পূর্ণ ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগের পর সফলতা অর্জিত হলে মানুষ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠে। আবার কখনো ব্যর্থতা দেখলে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তকদিরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকারের দুর্বলতা থেকে হিফাযত করে। ব্যক্তি কোনো বিপদে পতিত হলে তকদিরে বিশ্বাসের ফলে মুমিন কখনো মনোবল হারায় না।

দোআ ও আমল দ্বারা তকদির পরিবর্তন

দোআ ও আমল দ্বারা তকদির পরিবর্তন হয়। আল্লাহ্ তাআলার সকল ক্ষমতার মালিক– এটাও তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.

অর্থ : নেক আমল দ্বারাই বয়স বৃদ্ধি পায় আর দোআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আর ব্যক্তি তার গুনাহের কারণে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত হয়।

(ইবনে মাজা, ১২/২৮ ও মিশকাত, ৪১৯)

তকদিরের প্রকার

তকদির দু প্রকার । যথা–

(১) তকদিরে মুবরাম (اَلتَّقْدِيْرُ الْمُبْرَمُ) : যা নির্ধারিত; কোনো দিন পরিবর্তন হয় না।

(২) তকদিরে মুয়াল্লাক (اَلتَّقْدِيْرُ الْمُعَلَّقُ) : যা দোআ ও নেক আমল ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তন হয়।

দোআ দ্বারা তকদির পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হলো : বান্দার দোআর মাধ্যমে কিছু বিষয়ে পরিবর্তন হবে। এ কথাও তকদিরে লেখা আছে। এখন যদি বান্দা বেশি বেশি দোআ না করে, তবে তকদিরের পরিবর্তনের আশাও করা যায় না। আর দোআ কবুলের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এ জন্য বেশি বেশি দোআ করা উচিত। নেক আমল বেশি করা প্রয়োজন যাতে বয়স বৃদ্ধি হয়ে আরো নেক আমল করার সুযোগ পায়। তবে শেষ পর্যন্ত যে কী হবে–তাও আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. تقدير শব্দটি কোন বাবের مصدر?

ক. إفعال
খ. تفعيل
গ. تفاعل
ঘ. تفعل

২. তকদির কত প্রকার?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

৩. আল্লাহ তাআলা কোনটি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন?

ক. আসমান
খ. জমিন
গ. জান্নাত
ঘ. কলম

৪. কোন বিষয়টি তকদির পরিবর্তন করতে পারে?

ক. সালাত
খ. সাওম
গ. হজ্জ
ঘ. দোয়া

৫. تَقْدِيْرٌ শব্দের মাদ্দাহ কী?

ক. ق د ر
খ. ق ی ر
গ. ق د ی
ঘ. ق د و

৬. রাসুল (সা.) কাদের সাথে উঠা-বসা করতে নিষেধ করেছেন?

ক. কাফেরদের সাথে

খ. মুশরিকদের সাথে

গ. তকদিরে অবিশ্বাসীদের সাথে

ঘ. অগ্নি পূজারীদের সাথে

৭. কোন বিষয়টির কারণে মানুষ নির্ধারিত রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়?

ক. লোভ

খ. অলসতা

গ. দুর্বলতা

ঘ. গুণাহ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. তকদির কী? তকদিরের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

২. 'মানুষের তকদির নির্ধারিত' দলিলসহ বর্ণনা কর।

৩. তকদির কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

৪. তরিকত ও মারেফতের পরিচয় ও গুরুত্ব লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

ইলমুত তাযকিয়া ওয়াত তাসাউফ

عِلْمُ التَّزْكِيَةِ وَالتَّصَوُّفِ

(আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান)

তরিকত ও মারেফাতের পরিচিতি

তরিকা (اَلطَّرِيْقَةُ) শব্দের অর্থ পন্থা, উপায়, রীতি, পথ। ইলমুত তাসাওফের পরিভাষায়–

اَلطَّرِيْقَةُ هِيَ السِّيْرَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالسَّالِكِيْنَ اِلٰى مَنْ قَطَعَ الْمَنَازِلَ وَ التَّرَقِّيْ فِي الْمَقَامَاتِ

অর্থ : অর্থ: আধ্যাত্মিকতার ধাপসমূহ অতিক্রম করে উন্নতির সোপানে ধাবমান পথিকদের বিশেষ কর্মধারাকে তরিকত বলে। (কাওয়ায়েদুল ফিক্হ, ৩৬২)

মারেফত (اَلْمَعْرِفَةُ) শব্দের অর্থ পরিচয় ও শিক্ষা। পরিভাষায় মারেফাত বলতে বোঝায়–

إِحَاطَةُ الشَّيْءِ بِعَيْنِ الشَّيْءِ كَمَا هُوَ

অর্থ : যে বিষয় বা বস্তু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আয়ত্তে আনা। (মানাযিলুস্ সায়েরিন, ১১২)

তরিকত ও মারেফাতের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

তরিকত, মারেফাত, হাকিকত, তাযকিয়া, ইরফান, ইহসান, এ সকল জ্ঞানের সমন্বিত বিষয়কে ইলমুল ইরফান বা ইলমুত তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয়। শরিয়তের ইলম শিক্ষা করা যেভাবে ফরজে আইন, অনুরূপ যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষার ফলে মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধ ও মার্জিত হতে পারে, ততটুকু তাসাউফ শিক্ষা করাও ফরজে আইন। তরিকত ও মারেফাতের জ্ঞানের সূচনা হয় আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে পাওয়ার চেতনা মনে জাগরুক করার মাধ্যমে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে–

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থ : আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো, যেন তাঁকে দেখছো। আর যদি দেখতে না পাও, তবে (অবশ্যই এ বিশ্বাস রাখবে যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহিহ বুখারি)

ইমাম বুখারি (رحمه الله) বলেন–

اِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ

অর্থ : মারেফাত হলো কালবের কাজ। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইমান)

যে কর্মের দ্বারা গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর যিকির-ফিকর, ধ্যান ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের বন্ধুতে পরিণত হয়– তাই মারেফাত। যেহেতু এ কাজটি সম্পূর্ণ বাস্তব প্রশিক্ষণ নির্ভর কাজ তাই - একজন যোগ্য প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নিজের প্রচেষ্টায় এ ইলম অর্জন করতে হয়।

অলির পরিচয়

অলি (وَلِىٌّ) অর্থ বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। বহুবচনে আউলিয়া (أَوْلِيَاءُ)। وَلِىُّ اللهِ অর্থ হলো আল্লাহর প্রিয়বন্ধু। পরিভাষায় অলি বলা হয়–

هُوَ الْعَارِفُ بِاللهِ تَعَالٰى وَ صِفَاتِهِ حَسْبَ مَا يُمْكِنُ الْمَوَاظِبُ عَلٰى الطَّاعَاتِ اَلْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِى الْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِى اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ.

অর্থ : যিনি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান রাখেন, আনুগত্যমূলক কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, পাপ কাজ থেকে দূরে থাকেন এবং বিলাসিতা ও কুরুচিপূর্ণ কাজে মগ্ন হওয়া থেকে বিমুখ থাকেন। (আকাইদে নাসাফি)

অলির বৈশিষ্ট্য

অলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ। (সুরা ইউনুস, ৬৩)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর অলি কারা? জবাবে তিনি বলেন– إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ

অর্থ : যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

أَوْلِيَاءُ اللهِ قَوْمٌ صَفَرَ الْوُجُوْهُ مِنَ السَّهْرِ، عَمَشَ الْعُيُوْنُ مِنَ الْعَبَرِ، خَمَصَ الْبُطُوْنُ مِنَ الْجُوْعِ، يَبَسَ الشِّفَاهُ مِنَ الذِّكْرِ.

অর্থ : আল্লাহর অলি হলেন ঐ সমস্ত লোক, রাত্রি জাগরণের কারণে যাঁদের চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, অধিক অশ্রু ফেলার কারণে যাঁদের চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে, ক্ষুধা সহ্য করতে করতে যাঁদের পেট শুকিয়ে চিকন হয়ে গেছে, অধিক যিকির করায় লালা বা থুথু না লাগার কারণে যাঁদের ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। (তাফসিরে কুরতবি- ৮/২৫৭)

'আল্লাহর যিকিরে যাদের গা শিউরে ওঠে, চক্ষু ক্রন্দন করে, অন্তর প্রশান্ত হয় তারাই অলি।

(ইবনু কাছির, ৭/৯৫)

অলিগণের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা

শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের সকল স্তর অতিক্রম করে আমল, আখলাক, নম্রতা, ভদ্রতা, দানশীলতা, ইবাদত-বন্দেগিতে যিনি পরীক্ষিত, যাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, আকিদা ও আমলে যিনি সত্যের প্রতিবিম্ব তার সাথী হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।

(সুরা তওবাহ, ১৯)

অলিগণের সুহবতে থাকলে তাঁর পরিচর্যায় খারাপ আমল দূর হয়ে ভালো আমল করার অভ্যাস গড়ে উঠে। রসুল (ﷺ) বলেন–

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ

অর্থ : সৎসঙ্গীর উদাহরণ আতরওয়ালার মতো। তার সাথে থাকলে আতর পাওয়া না গেলেও আতরের সুগন্ধি পাওয়া যাবে। (সুনানু আবি দাউদ)

মাওলানা রুমী (রহ.) তাইতো বলেন–

یک زمانه صحبت با اولیاء

بهتر از صد سال طاعت بے ریاء

এক যামানা সোহবতে বা আউলিয়া

বেহতর আয ছদ সালে তাআত বেরিয়া

অর্থ : এক মুহূর্ত ওলির সাহচর্য একশ বছরের রিয়াহীন এবাদাতের চেয়েও উত্তম।

তিনি আরো বলেন–

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ

সোহবতে তালেহ তোরা তালে কুনাদ

অর্থ : সৎ লোকের সঙ্গী হলে তোমাকে সৎ মানুষে পরিণত করবে। অসৎ লোকের সাথী হলে তোমাকে অসৎ বানাবে।

অলিগণের মর্যাদা

ওলিগণের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : ভালোভাবে জেনে নাও, আল্লাহর ওলিগণের না আছে ভবিষ্যতের ভয় এবং না আছে অতীতের কোনো দুশ্চিন্তা। (সুরা ইউনুস, ৬২)

অলিগণের মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

অর্থ : সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে অবশ্যই দিয়ে থাকি। যদি সে আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। (সহিহ বুখারি, ৬০২১)

অন্য হাদিসে আছে–

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছেন তারা যদি আল্লাহর নামে কসম করে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা পূরণ করেন। (মুসনদে আহমদ, ১৯/৩১৪)

অলিগণের কারামত

অলিগণের কারামত সত্য - كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ

ইমাম তাহাবী বলেন– وَنُؤْمِنُ بِمَاجَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ رِوَايَاتِهِمْ

অর্থ : আমরা তাদের কারামত-অলৌকিক ঘটনাবলি এবং বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে পরিবেশিত তাদের বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ বিশ্বাস করি।

অলিগণের কারামত সম্পর্কে কুরআন মাজিদে এবং হাদিস শরিফে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। হজরত সুলায়মান (ﷺ) এর সাহাবি আসিফ বিন বরখিয়া চক্ষুর পলকের মধ্যে সাবার রাণী বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামেন থেকে ফিলিস্তিনে আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে নিয়ে আসা, ওমর (ﷺ) এর লিখিত চিঠি পেয়ে নীল নদে পানির জোয়ার সৃষ্টি হওয়া, হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (ﷺ) এর নেতৃত্বে ষাট হাজার ঘোড়া ইরাকের দজলা নদী পার হওয়া, খাজা মইনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বিশাল দিঘি আনা সাগরের পানি একটি লোটায় স্থান করে নেওয়া; এ সবই ওলিগণের কারামত। এ সব কারামতকে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ। তবে ওলি হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ হওয়া শর্ত নয়। দীনের উপর অটল থাকাই হলো ওলির বড় কারামত।

অলিগণের মাযার শরিফ যিয়ারত

অলিগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : জেনে রাখ ! আল্লাহর অলিগণের ভবিষ্যতের কোনো ভয় নেই, (অতীতের) কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর ঘোষণার কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই মহা সাফল্য। (সুরা ইউনুস, ৬২-৬৪)

অলিগণ যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত, তাই তাদের মাযার শরিফে গিয়ে তাদের মর্যাদার ওসিলা করে দোআ করলে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধুর সম্মানে দোআ কবুল করেন।

আলি ইবনে মায়মুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) এর দ্বারা বরকত হাসিল করি। আমি প্রায়ই তাঁর কবর যিয়ারতে যাই। আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করে আবু হানিফা (ﷺ) এর কবরের কাছে এসে দোআ করি। এতে দ্রুত দোআ কবুল হয়। (তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি ১/২০৩)

তবে, মাযারে গিয়ে কোনো অলির কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া অবৈধ। চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। অলিকে উসিলা করে ও তাঁর মাযার শরিফের কাছে গিয়ে দোআ করলে আল্লাহ তাআলা অলির সম্মানে দোআ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলার রসুল নিজেও কবর যিয়ারত করতেন।

ইসালে সওয়াব

ইসালে সওয়াব (اِيْصَالُ الثَّوَابِ) অর্থ সওয়াব পৌঁছানো। নিজের নেক আমলের সওয়াব অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য। কোনো মানুষ অপর কারো জন্য কোনো আমলের সওয়াব পৌঁছাতে চাইলে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে জায়েয। চাই সে আমল সালাত হোক বা সাওম বা হজ বা সদকা-খয়রাত বা কুরআন শরিফ তেলাওয়াত ইত্যাদি। এ সকল আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে যায়। আর এ আমল তাদের উপকারে আসে। (মারাকিউল ফালাহ্ হতে তাহতাবির হাশিয়া, ৩৭৬)

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (ﷺ) বর্ণনা করেন–

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ

অর্থ : এক ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ) এর কাছে আরজ করলো, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন এবং আমার ধারণা যে যদি তিনি কিছু কথা বলতে পারতেন তাহলে সদকা করতেন। যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে কি তার কোনো ফায়দা হবে? নবি করিম (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'।

(সহিহ বুখারি, ১/১৮৬)

কোনো ব্যক্তির ইসালে সওয়াব। একা একা করলে তাতেও ফায়দা আছে। আর সম্মিলিতভাবে অধিক সংখ্যক লোকের দোআ আল্লাহ্ কবুল করেন এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো আলেম বা অলি থাকেন তার সম্মানে সকলের দোআ কবুল হয়।

তাসাউফের ইলম অর্জনের বিরোধিতার পরিণাম

তাসাউফের ইলম অর্জন করা শরিয়তের ইলমের মতোই অপরিহার্য। যারা এ ইলম অর্জনের বিরোধিতা করে তারা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে চায়। দীনের মৌলিক তিনটি স্তম্ভ ইমান, ইসলাম ও ইহসান। ইমান-আকিদা বিশ্বাস দীনের প্রথম রোকন। ইসলাম বা ফিক্হ আমলী জীবন, আর ইহসান, তাযকিয়া, মারেফত, হাকিকত সব মিলিয়ে ইলমে তাসাউফ। যা অস্বীকার করলে দীনের তিন ভাগের একভাগ অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

অর্থ : সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবে না, যার অন্তর আমার যিকির থেকে গাফেল এবং যে আপন খেয়াল খুশির অনুসারী। (সুরা কাহাফ, ২৮)

ইমাম মালেক (ﷺ) বলেন–

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি ফিক্হ ছাড়া তাসাউফ অর্জন করে সে যিনদিক (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় এবং যে তাসাউফ অর্জন ছাড়া ফিক্হ অর্জন করে সে ফাসিক। আর যে উভয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী। (মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الطريقة শব্দের অর্থ কী?

ক. পন্থা খ. আদর্শ
গ. আকৃতি ঘ. বিধান

২. ইলমুত তাসাউফ অর্জন করার শরয়ি বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. আউলিয়ায়ে কেরামের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা কী?

ক. চিন্তামুক্ত থাকা যায় খ. আল্লাহর কথা স্মরণ হয়
গ. ভালো পানাহারের ব্যবস্থা হয় ঘ. বিত্তবান হওয়া যায়

৪. اَلْمَعْرِفَةُ শব্দের অর্থ কী?

ক. পরিচয় খ. জ্ঞান
গ. অদৃশ্য ঘ. শ্রবণ

৫. إِيْصَالُ الثَّوَابِ অর্থ কী?

ক. সাওয়াব অর্জন করা | খ. সওয়াব পৌছানো
গ. সওয়াবের প্রতি আগ্রহ | ঘ. কাপড় পৌছানো

৬. মারেফত কিসের কাজ?

ক. মাথার | খ. কলবের
গ. বুকের | ঘ. হাতের

৭. অলি হওয়ার জন্য কোন বিষয়টি আবশ্যক?

ক. বড় আলেম হওয়া | খ. শহীদ হওয়া
গ. তাকওয়া | ঘ. মসজিদ নির্মাণ করা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. অলির পরিচয় ও অলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২. অলিগণের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা বর্ণনা কর।

৩. অলিগণের মর্যাদা ও তাদের কারামত সত্য দলিলসহ বর্ণনা কর।

৪. ইসালে সাওয়াব কী? এর হুকুম দলিলসহ বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় ভাগ

আল ফিকহ

اَلْـفِـقْـهُ

প্রথম অধ্যায়

ইলমে ফিকহের ইতিহাস

تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهِ

প্রথম পাঠ

ইলমে ফিকহ

ইসলাম, এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর এই জীবনব্যবস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধানের সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের নাম ফিকহ। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এ শাস্ত্রের ভিত্তি। কোনো সমস্যার উদ্ভব ঘটলে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তার সমাধান করতে হয়। তাতে সমাধান পাওয়া না গেলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে করতে হয়।

প্রিয় নবি (ﷺ) এর যামানায় উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান ওহির জ্ঞানের মাধ্যমে তিনিই দিয়ে গেছেন। কাল-পরিক্রমায় যখন নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে, তখন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ফকিহগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ইলমে ফিক্হের সুবিন্যস্ত শাস্ত্র উপহার দেন। যারা এ গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেন, তাদেরকে আইম্মায়ে মুজতাহিদিন (اَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ) বলা হয়। বস্তুত ইসলাম যে সকল যুগের সমস্যার সমাধানে সক্ষম ইলমে ফিক্হ-ই তার জীবন্ত উদাহরণ।

যে সকল মুজতাহিদিনের অবদানে বিশ্ব-মুসলিম সুবিন্যস্ত আকারে বিধি-বিধান পেয়েছে তাদের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله), ইমাম মালিক (رحمه الله), ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله), ইমাম আওযায়ি (رحمه الله), ইমাম সুফিয়ান সাওরি (رحمه الله) ও ইমাম যুহরি (رحمه الله) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পাঠ

মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

দলিল গ্রহণ সাপেক্ষে মাযহাবের অনুসরণ অপরিহার্য। ফকিহ মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) তথা কুরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত দলিল ভিত্তিক সমাধান সাধারণ মুসলমান মেনে নেবেন এটাই কুরআন মাজিদের নির্দেশ। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ: হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর আর আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর বা নির্দেশ দানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের।

(সুরা নিসা, ৫৯)

উলুল আমর বলতে মুসলিম ফকিহ শাসকগণকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের দাবি হলো মুসলমানদের যিনি শাসক হবেন, তাকে أُولُوا الْأَمْرِ হতে হবে।

আর তিনি যদি সে পর্যায়ের না হন তাহলে ফকিহ আলেমগণই ফয়সালা দেবেন। যে ব্যক্তি শরিয়তের বিধানাবলি ও তার উৎসমূল সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিফহাল নন, তার জন্য মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। যারা কিছু কিছু ইলম জানেন, কুরআন হাদিসের তরজমা বুঝেন অথচ কুরআন হাদিসের গভীর জ্ঞান নেই তাদের জন্যও মাযহাবের অনুসরণ ওয়াজিব। এমন ব্যক্তি যদি তার মাযহাবের ফতোয়া বা আমলের বিপরীত কোনো আয়াত বা হাদিস দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে ভয়ঙ্কর গোমরাহির শিকার হবেন।কারণ, কুরআন হাদিস গবেষণার আলোকে মাসাইল অনুসরণ ও নির্ণয় এক সুকঠিন কাজ। যে ব্যক্তি এর মর্ম বুঝতে পারেনি তাকে মনে করতে হবে যে– আমার ইমামের কাছে নিশ্চয়ই এর বিপরীতে এর চেয়েও শক্তিশালী কোনো দলিল আছে। একজন মুকাল্লিদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, মাযহাবের কোনো মাসয়ালা বা সিদ্ধান্ত দলিল ছাড়া গ্রহণ করা হয়নি। কুরআন ও হাদিসের শুধু তরজমা জেনে ও ভাসা-ভাসা জ্ঞান অর্জন করে শরিয়তের কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা।

কেননা تَفَقُّهٌ فِي الدِّيْنِ বা দীনের গভীর জ্ঞান ছাড়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে যে ভুল হবে, তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ أَفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

অর্থ: যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দিবে, তা আমলকারীর গুনাহ ফতোয়াদানকারীর ওপর বর্তাবে।

তৃতীয় পাঠ

হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য

ইমাম আযম আবু হানিফা (ﷺ) এর নেতৃত্বে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে গবেষকগণ যে কার্যক্রম শুরু করেন সেখান থেকেই হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি।

ইমাম আযম আবু হানিফা (ﷺ) সে সময়ের নব উদ্ভূত সকল সমস্যার এবং অনাগত ভবিষ্যতে উত্থাপিত হতে পারে সম্ভাব্য এমন সব জিজ্ঞাসার জবাব দানের জন্য তাঁর চল্লিশ জন সুযোগ্য মুজতাহিদ ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ফিক্‌হ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের নাম ছিলো (اَلْمَجْلِسُ الْعَامُ) সাধারণ পরিষদ। এ বোর্ডের মাধ্যমে তাঁরা দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ফিক্‌হ শাস্ত্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন।

উক্ত বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য থেকে দশজন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করা হয়, এ বোর্ডের নাম ছিলো (اَلْمَجْلِسُ الْخَاصُّ) বিশেষ উচ্চ পরিষদ। এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম দাউদ তাঈ, আসাদ ইবনে ওমর, ইউসুফ ইবনে খালিদ, ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়িদ (ﷺ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিকহশাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ বিশেষ বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। এর কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, বোর্ডের সামনে কোনো একটি মাসয়ালা পেশ করা হতো। অতঃপর তা পর্যালোচনা শেষে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে ৯৩ হাজার মাসয়ালা কুতুবে হানাফিয়াতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সংকলনে আটত্রিশ হাজার মাসয়ালা ছিলো ইবাদত সংক্রান্ত, অবশিষ্ট ছিলো মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ-রাষ্ট্র, বিচার-আচার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত, পরবর্তীতে এ সংকলনের মাসয়ালা সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সুখের বিষয় অদ্যাবধি মানুষ এমন কোনো সমস্যায় পড়েনি, যার সমাধান ফিকহে হানাফিতে নেই।

পরবর্তীতে ইমাম আবু ইউসুফ (ﷺ) আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হওয়ায় এবং ইমাম মুহাম্মদ (ﷺ) এর গ্রন্থাবলি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় অতি অল্প সময়ে হানাফি মাযহাব প্রসার লাভ করে। বর্তমানে সারা বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলমান হানাফি মাযহাবের অনুসারী।

চতুর্থ পাঠ

প্রধান কয়েকজন ইমামের জীবনী

ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর জীবন ও কর্ম

ইসলামি আইন সুবিন্যস্তকরণে ও তা প্রচার প্রসারে যে সকল মুসলিম মুজতাহিদ আলেম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) তাঁদের সবার শীর্ষে। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন হাদিস বিশ্লেষণ করে এ সকল বিষয়ের সারনির্যাস নিয়ে স্বতন্ত্ররূপে ফিকহশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, যা বিশ্ব মুসলিমকে তাদের যাবতীয় সমস্যার কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান উপহার দিয়েছে।

পরিচয়

নাম নুমান, উপনাম আবু হানিফা এবং উপাধি ইমামে আযম। পিতা- সাবিত, দাদা- যাওত আল কুফী। যা আরবিতে একসাথে এভাবে বলা যায়-

اَلْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ نُعْمَانُ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الزَّوْطِ الْكُوْفِيُّ رَحِمَهُ اللهُ

তিনি ৮০ হিজরি মোতাবেক ৬৯৯/৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত নগরী কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুঠামদেহি ও মধ্য গড়নের, উত্তম চেহারার অধিকারী ও মিষ্টভাষী।

শিক্ষাকাল

বাল্যকাল থেকেই ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তুখোড় মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাদা যাওত হজরত আলি (رضي الله عنه) এর নিকট দোআ করার জন্য তাঁর পিতাকে নিয়ে আসেন। হযরত আলি (رضي الله عنه) তাঁর পিতার জন্য বিশেষভাবে দোআ করেন। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এ দোআরই ফসল বলে অনেকে মনে করেন।

বাল্যকালে ইমাম সাহেবের বিদ্যা শিক্ষার চেয়ে ব্যবসার প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল । তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। একদিন ইমাম শাআবি (رحمه الله) তাকে বলেন–

'তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি আলেমদের সাথে উঠা বসা করো।'

এ উপদেশের পর থেকেই তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং জ্ঞানসিন্ধুর অমূল্য রত্ন আহরণ শুরু করেন। ইমাম হাম্মাদ (رحمه الله) এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ ১০ বছর জ্ঞান গবেষণায় রত থেকে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিক্হ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্র ছাড়াও তিনি ইলমে হাদিস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, নাহু, সরফ, প্রভৃতি বিষয়েও পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জন করেছেন। আবু হাকাম কবির (রহ.) বলেছেন, তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৪,০০০ । ইমাম আযম (রহ.) ৭০ হাজার হাদিস থেকে ফিকহ এর মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইমাম মালেক (রহ.) এর মুয়াত্তা সংকলনের পূর্বে كِتَابُ الاٰثَارِ (কিতাবুল আসার) নামে হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেন।

অবদান

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অবদান অপরিসীম ও অতুলনীয়। ১২০ হিজরিতে ইমাম আবু হানিফার (রহ.) পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হাম্মাদ (রহ.) ইন্তেকাল করলে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মীতারও অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার ছাত্র আগমন করতো শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। তাই তিনি শিক্ষাদানের নিমিত্তে কুফায় مَجْلِسُ تَدْوِيْنِ الْفِقْهِ নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান ছাত্রগঠনে ও ফিকহশাস্ত্র সংকলনে বিশেষ অবদান রাখে।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.), ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি (রহ.) ও ইয়াহইয়া (রহ.)।

সাহিত্যে অবদানঃ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলি রচনা করে ইলমি জগতে অনন্য অবদান রাখেন–

১. اَلْمُسْنَدُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ - আল মুসনাদু ইমাম আ'যম
২. اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ - আলফিকহুল আকবার
৩. كِتَابُ الْآثَارِ - কিতাবুল আসার
৪. مَكَاتِيْبُ وَوَصَايَا اَبِيْ حَنِيْفَةَ - মাকাতিব ও ওসায়া আবি হানিফা
৫. قَصِيْدَةُ النُّعْمَانِ - কাসিদাতু নোমান
৬. كِتَابُ الْعِلْمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ - কিতাবুল ইলম ওয়াল মুতায়াল্লিম
৭. كِتَابُ الرَّدِ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ - কিতাবুর রদ্দি আলাল কদরিয়া

এ ছাড়াও যে সকল গ্রন্থ হানাফি ফিকহের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে তা নিম্নরূপ–

(١) اَلزِّيَادَاتُ (٢) اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ (٣) اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرُ (٤) كِتَابُ الْخَرَاجِ (٥) اَلْوَاهِيَّةُ (٦) كِتَابُ الْحَجِّ

(٧) اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ (٨) اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ (٩) اَلْمَبْسُوْطُ (١٠) اِخْتِلَافُ الْفِقْهِ (١١) اَلْوِجْدَانُ.

এ সকল গ্রন্থ এ মহান মনীষীর ইলমের উৎস থেকেই রচিত। তিনি নিজে কোন মাযহাবের নাম দিয়ে যাননি। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রদের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায় তার নামানুসারে মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফি মাযহাব। তিনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফিকহশাস্ত্র সংকলন করে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে রয়েছেন।

আব্বাসীয় খলিফা মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা মানসুর তাঁকে কারাগারে বন্দী করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন। পরিশেষে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরি ১২ জমাদিউল উলা মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর জানাজায় এত লোক একত্রিত হয়েছিলো যে, পাঁচ বার সালাতে জানাজা পড়তে হয়েছিল। তাঁর সর্বশেষ জানাজায় ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাম্মাদ (ﷺ)। তাঁকে গোসল প্রদান করেন কুফার প্রধান বিচারপতি হাসান ইবনে ওমরা। বাগদাদের খাইযুরান নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমামে আযম (ﷺ)

ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (ﷺ) বলেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ فَهُوَ عِيَالٌ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.

অর্থ: যে ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায়, সে যেন ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-এর পরিবারভুক্ত হয়।

ইমাম ইবনে মুবারক (ﷺ) বলেন–

اَفْقَهُ النَّاسِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مَا رَأَيْتُ فِي الْفِقْهِ مِثْلَهُ.

অর্থ: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহ বিশারদ হলেন ইমাম আবু হানিফা (ﷺ), আমি ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর মতো যোগ্য কাউকে দেখিনি।

ফিকহে হানাফির বৈশিষ্ট্য

১। হানাফি ফিকহ তত্ত্ব, তথ্য, হিকমাত ও কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল

২। نَصٌّ মূলসূত্র দ্বারা প্রমাণিত শক্তিশালী মত গ্রহণ

৩। কুরআন মাজিদকে প্রাধান্য দান

৪। কিয়াস ও ইস্তিহসানের প্রতি বিশেষ জোর প্রদান

৫। তাহযিব-তমদ্দুনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে ফিকহ রচনা

৬। কুরআন ও হাদিসের দলিলসমূহকে যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করে কোনটি আইন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ণয় করা

৭। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের আমলকে যথার্থ মূল্যায়ন

ইমাম মালেক (ﷺ) এর জীবন ও কর্ম

পরিচয়

নাম-মালেক, উপনাম-আবু আবদুল্লাহ, উপাধি- ইমামু দারিল হিজরত, পিতা- আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের (ﷺ)। তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনা তয়্যিবায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনিই মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যকাল থেকেই কুরআন ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে স্থান লাভ করেন।

কর্ম

তিনি ইমাম আযমের পর হাদিসশাস্ত্রের প্রথম বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' সংকলন করেন, যা উম্মুছ সহিহাইন বা বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের জননী নামে খ্যাত। এই কিতাবটি 'মুআত্তা মালেক' (اَلْمُوَطَّا لِإِمَامِ مَالِكٍ) নামে পরিচিত। প্রায় ১,৭০০ হাদিস এতে স্থান পেয়েছে। মিসর, স্পেন, ইরাক, মরক্কো, জর্দান ও উত্তর আফ্রিকাতে মালেকি মাযহাবের অনেক অনুসারি রয়েছে।

ইন্তেকাল

আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করার কারণে তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে ১৭৯ হিজরি ১১ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭৯৫ খ্রি. জুন মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

ইমাম শাফেয়ি (ﷺ) এর জীবন ও কর্ম

পরিচয়

নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম ইদরিস, মাতার নাম উম্মুল হামযা। তাঁর পূর্ব পুরুষ শাফেয়ির নামানুসারে তিনি শাফেয়ি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইমাম শাফেয়ি (ﷺ)-এর নাম অনুসারে এ মাযহাবকে শাফেয়ি মাযহাব বলা হয়। তিনিই এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন মাজিদ হিফয করেন। দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্থ করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করলে উস্তাদগণ তাঁকে ফতোয়া দানের সনদ দেন। তিনি অসাধারণ মেধা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম মালিক (ﷺ) ও ইমাম মুহাম্মদ (ﷺ) তার শিক্ষক ছিলেন। ফিকহশাস্ত্রে তার অবদান অপরিসীম।

কর্ম

উসূলে ফিকহের মৌলিক নীতিমালা ইমাম আবু হানিফা (ﷺ), ইমাম মালিক (ﷺ), ইমাম আবু ইউসুফ (ﷺ), ইমাম মুহাম্মদ (ﷺ), নির্ধারণ করলেও একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে উসূলে ফিকহ (أُصُوْلُ الْفِقْهِ) শাস্ত্রের তিনিই স্থপতি।

তিনি সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহ বিষয়ে 'আর-রিসালা' (اَلرِّسَالَةُ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম' (كِتَابُ الْأُمِّ) অন্যতম। তাঁর উদ্ভাবিত মাযহাব হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মাঝামাঝি পন্থা। ইলমে হাদিসে তাঁর দক্ষতার জন্যে ইরাকের আলেমগণ তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা হাদিসের সহায়ক উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইন্তেকাল

হিজরি ২০৪ সনের রজব মাসের শেষ দিন মুতাবেক ৯২০ খ্রি. ২০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মিসরের ফুসতাতে ৫৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মিসরের ফুসতাতে তাঁর মাযার শরিফ রয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ﷺ) এর জীবন ও কর্ম

পরিচয়

নাম আহমদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি শায়খুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ। পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম হাম্বল।

তিনি ১৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস মুতাবেক ৭৮০ ঈসায়ি সনের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দাদার নামানুসারে তাঁর মাযহাবের নাম হয় হাম্বলী। তিনি প্রথম জীবনে বাগদাদ নগরেই কুরআন হাদিস ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপে গমন করেন এবং কুরআন হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কর্ম

তিনি ৮ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করে ৩০ হাজার সহিহ হাদিসের সমন্বয়ে 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন, যা 'মুসনাদু আহমাদ ইবনে হাম্বল' (مُسْنَدُ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ) নামে পরিচিত।

ইন্তেকাল

তিনি ২৪১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (ؒ)

ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব ১১৭হিজরি সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনে আবু লাইলা (ؒ) এর নিকট ফিকহ, ইমাম মালিক (ؒ) এর নিকট হাদিস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক (ؒ) এর কাছ থেকে তিনি সমরনীতি ও ইতিহাস শিখেছেন। তার স্মরণশক্তি এত প্রবল ছিল যে, একই বৈঠকে পঞ্চাশ ষাটটি হাদিস শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন।

পরিশেষে ইমাম আযম আবু হানিফা (ؒ) এর নিকট নিয়মিত ছাত্র হিসেবে জ্ঞানার্জন করেন। ইমাম আবু হানিফা (ؒ) প্রতিষ্ঠিত ফিকহ বোর্ডে দীর্ঘ ২২ বছর যে অবিরাম গবেষণা হয় ইমাম আবু ইউসুফ (ؒ) তাতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

১১৬ হিজরি সালে খলিফা মেহেদী আব্বাসী তাকে কাযী বা বিচারক হিসাবে নিয়োগ দান করেন। খলিফা হাদীও একই পদে তাঁকে বহাল রাখেন। বিচার-ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা দেখে বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁকে ইসলামি খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দান করেন।

১৮২ হিজরি সালের ৫ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার যোহরের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানি (ؒ)

ইমাম মুহাম্মদ বিন আল হাসান আশ-শায়বানি (ؒ) ইরাকের ওয়াসেত শহরে ১৩২ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মাশ'য়ার বিন কিদাম, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, মালিক বিন দিনার, ইমাম আওযায়ি (ؒ)সহ বহু মনীষীর কাছে কুরআন, হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর দুই বছর ইমাম আসেমের দরসে অংশগ্রহণ করেন। ইমাম ইউসুফ (ؒ) এর কাছেও তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে ইমাম মালেক (রহ.) এর কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেন। মূলনীতির ভিত্তিতে খুঁটিনাটি মাসয়ালা মাসায়িল রচনা ও হানাফি মাযহাবের ফিকহ সংকলনে তিনি বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত ছয়টি গ্রন্থকে জাওয়াহিরুর রেওয়ায়াত (ظَوَاهِرُ الرِّوَايَاتِ) বলা হয়ে থাকে। এই ছয়টি গ্রন্থ হলো–

(١) اَلزِّيَادَاتُ (٢) اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ (٣) اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرُ (٤) اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ

(٥) اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ (٦) اَلْمَبْسُوْطُ

এছাড়াও তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বর্ণিত হাদিসের সু-বিশাল গ্রন্থ كِتَابُ الْاٰثَارِ সংকলন করেন। ১৮৯ হিজরি সনে খলিফা হারুনুর রশিদের সফরসঙ্গী হিসেবে ইরানের রেই শহরে পৌঁছার পূর্বেই জাম্বুইয়া নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানেই এ জ্ঞান সূর্য অস্তমিত হল। ঐ স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ইসলামি জীবনব্যবস্থার বিধি-বিধানের সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের নাম কী?

ক. শরিয়ত খ. কুরআন

গ. হাদিস ঘ. ফিকহ

২. ইসলামি শরিয়তের উৎস কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩. ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ৬০ খ.৭০

গ. ৮০ ঘ. ৯০

৪. দলিল গ্রহণ সাপেক্ষে মাযহাবের অনুসরণ করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. মুস্তাহাব ঘ. জায়েজ

৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্মস্থান কোনটি?

ক. কুফা খ. বসরা

গ. বাগদাদ ঘ. দামেস্ক

৬. ইমাম আবু হানিফার শিক্ষকের সংখ্যা কতজন ছিল?

ক. ৩০০০ খ. ৪০০০

গ. ৫০০০ ঘ. ৩৫০০

৭. كِتَابُ الْآثَارِ কোন বিষয়ের গ্রন্থ?

ক. তাফসির খ. হাদিস

গ. ফিকহ ঘ. ইতিহাস

৮. اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

ক. আবু হানিফা (রহ.) খ. শাফেয়ী (রহ.)

গ. মালেক (রহ.) ঘ. আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

৯. মুআত্তা মালেক কিতাবে কতটি হাদিস স্থান পেয়েছে?

ক. ১৬০০ খ. ১৭০০

গ. ১৮০০ ঘ. ২০০০

১০. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন?

ক. ১৫০ খ. ১৬০

গ. ১৭০ ঘ. ১৪০

১১. ইমাম মালেক (রহ.) কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন?

ক. ১৬০ খ. ১৭৯

গ. ১৮০ ঘ. ১৯০

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২. হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩. ইমাম আবু হানিফা (রাহ.)-এর জীবন ও কর্ম আলোচনা কর।

৪. ইমাম মালেক (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম লেখ।

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম বর্ণনা কর।

৬. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

৭. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অবদানসমূহ লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত তাহারাত

اَلطَّهَارَةُ

প্রথম পাঠ

গোসল

اَلْغَسْلُ

গোসলের পরিচয়

গোসল (اَلْغَسْلُ) শব্দের অর্থ إِرَاقَةُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ তথা শরীরে পানি ঢালা।

শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ফকিহ্ আলেমগণ বলেন–

اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الطَّهُوْرِ فِيْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

অর্থ : নির্ধারিত কারণে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি ব্যবহারকে গোসল বলে।

(আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ১/১০৫)

গোসলের প্রকার

গোসল চার প্রকার। যথা–

(১) ফরজ গোসল, (২) সুন্নত গোসল, (৩) মুস্তাহাব গোসল ও (৪) মুবাহ গোসল।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১। اَلْجَنَابَةُ তথা শরীর নাপাক হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا.

অর্থ : তোমরা নাপাক হলে পবিত্র হয়ে নাও। (সুরা মায়েদা, ৬)

২। اِنْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ তথা হায়েয অথবা নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে গোসল ফরজ হয়।

গোসলের ফরজসমূহ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা–

(১) কুলি করা (اَلْمَضْمَضَةُ)

(২) নাকে পানি দেয়া (اَلْاِسْتِنْشَاقُ)

(৩) সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করা (غُسْلُ جَمِيْعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ)

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ভালো করে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুই হাত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। কুলি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভিতরে ভালো করে পানি পৌঁছাতে হবে।
অজুর পর মাথায় পানি ঢালতে হবে। এরপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ভালো করে মর্দন করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে এবং শরীর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। এরপর শরীরে দুইবার এমনভাবে পানি ঢালতে হবে, যেন কোনো স্থান শুকনো থাকার আশঙ্কা না থাকে। গোসলের পূর্বে অজুর সময় পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই, গোসলের শেষে পা ধৌত করতে হবে।

সর্বশেষে সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে কাপড় পরতে হবে। মেয়েদের বেলায় খোপা খুলতে হবে না; যদি চুলের ভিতর পানি প্রবেশ করে। আর যদি চুলের খোপাতে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে চুলের খোপা খোলা আবশ্যক।

নখে নখ পালিশ থাকলে, কপালে টিপ থাকলে, কানে বা নাকে যথাযথভাবে পানি না পৌঁছালে অথবা গড়গড়া করে কুলি করার সময় মুখের ভিতরের সবখানে পানি না পৌঁছলে শরীর পাক হয় না। এরূপ গোসল দ্বারা সালাত শুদ্ধ হয় না।

যে সব পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয

নদী, সমুদ্র, ঝরনা, বৃষ্টি, কূপ ও টিউবওয়েলের পানি সাধারণত পবিত্র। শিশির, বরফগলা পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয। গাছের পাতা বা অন্য কোনো বস্তু পড়ে যদি পানির তিনটি গুণ যথা– রং, স্বাদ ও গন্ধ। যদি এর একটি গুণ বিনষ্ট হয় এবং দুটি অবশিষ্ট থাকে, তবে সে পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়েও অজু গোসল করা জায়েয।

সুন্নত গোসল

সুন্নত গোসল চারটি। যথা–

(১) জুমুআর দিন ফজর সালাতের পর থেকে জুমুআর সালাত পর্যন্ত ঐ সকল লোকদের জন্য গোসল করা সুন্নত, যাদের উপর জুমুআর সালাত ফরজ।

(২) হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা সুন্নত।

(৩) হজ আদায়কারীদের জন্য আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের পর গোসল করা সুন্নত।

(৪) দুই ইদের সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নত।

মুস্তাহাব গোসল

মুস্তাহাব গোসল ৯টি। যথা–

(১) ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করা

(২) ছেলে মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত দেখা দিলে গোসল করা

(৩) মুজদালিফায় অবস্থানের গোসল

(৪) লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বারাতে সন্ধ্যার পর গোসল করা

(৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর

(৬) তওবাহ্ এর সালাতের জন্য

(৭) মদিনা শরিফে প্রবেশ কালে

(৮) তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল করা

(৯) ইসতিসকা সালাতের জন্য

মুবাহ গোসল

যে গোসল করা বা না করার ব্যাপারে শরিয়তের নিষেধ নেই, তা মুবাহ্ বা বৈধ। যেমন–

(১) গরমে স্বস্তি লাভের জন্য

(২) কোনো ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যতীত, শরীর সুস্থ রাখার জন্য গোসল করা

(৩) শরীরে ধুলোবালি লাগলে গোসল করা

(৪) নতুন পোশাক পরিধানের পূর্বে গোসল করা

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الغسل অর্থ কী?

ক. হাত ধৌত করা　　খ. মুখ ধৌত করা
গ. শরীরে পানি ঢালা　　ঘ. ময়লা পরিষ্কার করা

২. গোসল কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৫ প্রকার

৩. গোসলের ফরজ কয়টি?

ক. ১ টি　　খ. ২ টি
গ. ৩ টি　　ঘ. ৪ টি

৪. হায়েয নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে গোসলের হুকুম কী?
ক. মুস্তাহাব　　খ. ফরজ
গ. সুন্নত　　গ. জায়েজ

৫. হজের ইহরাম বাধার জন্য গোসল করার হুকুম কী?
ক. ফরজ　　খ. সুন্নত
গ. ওয়াজিব　　ঘ. মুস্তাহাব

৬. ওমরার ইহরাম বাধার জন্য গোসল করার হুকুম কী?
ক. ফরজ　　খ. সুন্নত
গ.ওয়াজিব　　ঘ. মুস্তাহাব

৭. হজ আদায়কারীর জন্য আরাফার দিন গোসল করার হুকুম কী?

ক. ফরজ　　　খ. সুন্নত

গ.ওয়াজিব　　　ঘ. মুস্তাহাব

৮. ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করার হুকুম কী?

ক. সুন্নত　　　খ. মুস্তাহাব

গ. ওয়াজিব　　　ঘ. ফরজ

৯. গরমে স্বস্তি লাভের জন্য গোসল করার হুকুম কী?

ক. মুস্তাহাব　　　খ. সুন্নত

গ. মুবাহ　　　ঘ. মাকরুহ

১০. জুমআর দিন গোসলের হুকুম কী?

ক. ফরজ　　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　　ঘ. মুস্তাহাব

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। গোসলের পরিচয় দাও। গোসল ফরজ হওয়ার কারণ ও গোসলের ফরজসমূহ লেখ।

২। সুন্নত ও মুস্তাহাব গোসলসমূহ লেখ।

৩। গোসলের নিয়ম বিস্তারিত লেখ।

৪। যেসব পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েজ এর বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় পাঠ

মোজার উপর মাসেহ

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোজার পরিচিতি

مَا يَلْبِسُهُ الْإِنْسَانُ فِي قَدَمَيِ رِجْلِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ : পায়ের টাখনু গিরা পর্যন্ত মানুষ দুপায়ে যা পরিধান করে তাকে মোজা বলে।

মোজা যদি চামড়া, পশম, মোটা সুতার তৈরি হয়, তবে তাকে আরবিতে 'খুফফুন' (خُفٌّ) বলা হয়।

আর যদি চামড়া ছাড়া অন্যকিছুর তৈরি হয়, তবে তাকে 'জাওরাব' (الجَوْرَب) বলা হয়।

মুকিম এবং মুসাফির উভয়ের জন্য মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। তবে শরিয়তের পরিভাষায় যে মোজার ওপর মাসেহ করা যায়, সে মোজা চামড়ার তৈরি হতে হবে। কাপড়ের মোজা বা হাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا وَ لْيُصَلِّ وَ لَا يَخْلَعْهَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

অর্থ: তোমাদের কেউ অজু করে মোজা পরার পর তার উচিত ঐ মোজার উপর মাসেহ করে সালাত আদায় করা। গোসল ফরজ হয় এমন অপবিত্র হওয়া ছাড়া সে চাইলে এ মোজা না খুললেও চলবে।

(মুস্তাদরাক হাকিম)।

মোজা মাসেহ করার শর্তাবলি

১। দু'পা ধুয়ে পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা।

২। মোজা এতটুকু হতে হবে, যাতে যতটুকু স্থান ধোয়া ফরজ ততটুকু ঢেকে থাকে।

৩। এমন মোজা হতে হবে, যাতে পায়ের নিচ দিয়ে পায়ের চামড়া দেখা না যায়।

৪। মুকিমের জন্য একদিন এক রাতের অধিক না হওয়া। আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাতের অধিক সময় না হওয়া।

৫। মাসেহ করার পর মোজা না খোলা। যখনই মোজা খোলা হলে আবার পাসহ গোসল বা অজু করে নিতে হবে।

৬। মোজাদ্বয় অপবিত্র না হওয়া।

তায়াম্মুম অবস্থায় মোজা পরিধান করে থাকলে অজু করার সময় উক্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে না, এ অবস্থায় তাকে পা ধৌত করতে হবে।

গোসলকারীর জন্য মাসেহ জায়েয নেই। পায়ের অধিকাংশ অংশ কোনোভাবে ভিজে গেলে এ অবস্থায় মোজা খুলে পা ধোয়া আবশ্যক।

পায়ে ব্যান্ডেজ থাকলে এর উপরে মাসেহ করে নিলেই চলবে। তবে ব্যান্ডেজের বাহিরের অংশ অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।

মোজা মাসেহের বৈধ মুদ্দত

মুকিমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফেরের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। অজু করে মোজা পরিধান করার পর অজু নষ্ট হলে এই মুদ্দত শুরু হবে। যেমন কেউ যোহরের সালাতের পর মোজা পরিধান করল এরপর ইশার সময় অজু ভঙ্গ হল, সে ব্যক্তি ইশার সময় মোজা মাসেহ করল, সে সময় থেকে তার মোজা মাসেহের মেয়াদ ধরা হবে। হজরত আলি (ﷺ) বলেন—

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজা মাসেহের বিধান দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম)

মাসেহ করার পদ্ধতি

মাসেহ করতে হলে ডান পায়ের তলায় বাম হাত রেখে পায়ের উপরিভাগে ডান হাতের কমপক্ষে তিনটি আঙ্গুল ভিজিয়ে পায়ের আঙ্গুলের মাঝ থেকে উপরের দিকে মাসেহ করে নিয়ে আসতে হবে। বাম পায়ের নিচে বাম হাত রেখে কমপক্ষে ডান হাতের তিন আঙ্গুল ভিজিয়ে উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

ব্যান্ডেজ ও ক্ষত-এর উপর মাসেহ করা

ব্যান্ডেজ এক প্রকার ওযর। ব্যান্ডজের উপর মাসেহ করা জায়েয। তবে ব্যান্ডেজ ছাড়া বাকি স্থান পানি দিয়ে ধুতে হবে। তবে প্রতি ওয়াক্তের সালাত বা যে সকল কাজের জন্য অজু বা গোসল প্রয়োজন সে সকল কাজের জন্য অজু বা গোসল করার পূর্বে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তিন আঙ্গুলে পানি লাগিয়ে মাসেহ করতে হবে। ক্ষতস্থানে পানি লাগলে যদি ক্ষত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ক্ষতের উপর পবিত্র কাপড়ের টুকরা স্থাপন করে তার উপর দিয়ে একবার শুধু পানি লাগানো আঙ্গুল বুলালেই চলবে।

মাসেহের বৈধতা নষ্ট হবার কারণ

যেসব কারণে অজু ভেঙ্গে যায় সেসব কারণে মাসেহও ভেঙ্গে যায় । যেমন –

(১) গোসল ফরজ হলে

(২) মহিলাদের হায়েয নেফাস হলে

(৩) মোজা পা থেকে খুলে গেলে

(৪) মাসেহের মেয়াদ পূর্ণ হলে

(৫) মাযুর ব্যক্তি মাসেহ করে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করার পর তার মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন, অনবরত পেশাব ঝরা বা রক্ত পড়া ইত্যাদি

(৬) মোজার ভেতর পানি ঢুকে সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশি ভিজে গেলে

পাগড়ির উপর মাসেহের বিধান

ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা থাকলে, অথবা সফরে কষ্ট হবার আশঙ্কা থাকলে বিশেষ প্রয়োজনে পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয। তবে কপালের কিছু অংশ এ মাসেহের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَوَضَّأَ فِيْ سَفَرِهِ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَ عَلَى الْعَمَامَةِ.

অর্থ: নবি করিম (ﷺ) সফরে অজু করলেন, তাঁর কপাল মুবারক মাসেহ করলেন, তারপর পাগড়ির উপর মাসেহ করলেন।

নিয়মিত পাগড়ী ব্যবহার করলে স্থায়ী সর্দি হয় না, মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয় ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الخف। কী ধরনের মোজা?

ক. চামড়ার মোজা খ. পাতলা কাপড়ের মোজা

গ. মোটা কাপড়ের মোজা ঘ. প্লাস্টিক মোজা

২. মুসাফিরের জন্য মোজা মাসেহের মুদ্দত বা সময় কত দিন?

ক. ১ দিন, ১ রাত খ. ২ দিন, ২ রাত

গ. ৩ দিন, ৩ রাত ঘ. ৪ দিন ৪ রাত

৩. মোজাসহ পায়ের অধিকাংশ অংশ ভিজে গেলে এ অবস্থায় করণীয় কী?

ক. মোজা খুলে পা ধোয়া আবশ্যক

খ. মোজা না খুলে পা ধোয়া আবশ্যক

গ. তায়াম্মুম করা আবশ্যক

ঘ. ভিজা অবস্থায় রেখে দেয়া আবশ্যক।

৪. চামড়ার মোজাকে আরবিতে কী বলে?

ক. جورب খ. خف

গ. نعل ঘ. حذاء

৫. তায়াম্মুম করে মোজা পরিধান করলে অজুর সময় উক্ত মোজার উপর মাসেহ্ করার হুকুম কী?

ক. জায়েজ খ. নাজায়েজ

গ. মুস্তাহাব ঘ. মাকরুহ্

৬. গোসলকারীর জন্য মোজা মাসেহ করার হুকুম কী?

ক. জায়েজ খ. মুস্তাহাব

গ. নাজায়েজ ঘ. মাকরুহ

৭. বিশেষ প্রয়োজনে পাগড়ির উপর মাসেহ করার হুকুম কী?

ক. মাকরুহ খ. মুস্তাহাব

গ. জায়েজ ঘ. নাজায়েজ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। মোজার পরিচয় দাও। মোজা মাসেহ করার শর্তাবলী বর্ণনা কর।

২। মোজা মাসেহের মুদ্দত ও পদ্ধতি বিস্তারিত লেখ।

৩। ব্যান্ডেজ, ক্ষত ও পাগড়ির উপর মাসেহের বিধান লেখ।

৪। মাসেহের বৈধতা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লেখ।

২০২৫

তৃতীয় পাঠ

হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা

اَلْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْاِسْتِحَاضَةُ

হায়েযের ধারণা

বালেগ হওয়ার পর স্বভাবগতভাবে মহিলাদের জরায়ু থেকে রোগ-ব্যাধির কারণ ব্যতিরেকে যে রক্ত নির্গত হয়, একে শরিয়তের পরিভাষায় হায়েয (حَيْضٌ) বলে।

হায়েযের মেয়াদকাল

হায়েয হওয়ার বয়স কমপক্ষে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো বালিকার রক্তস্রাব দেখা দেয় তা হায়েয নয়: বরং ইস্তেহাযা (اِسْتِحَاضَةٌ) বা রোগজনিত রক্তস্রাব। হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিন তিনরাত (৭১ ঘণ্টা) সর্বোচ্চ সময়-সীমা দশদিন দশরাত (২৪০ ঘণ্টা) তাই তিনদিনের কম বা দশদিনের বেশি উভয়টাই (اِسْتِحَاضَةٌ) বা রোগজনিত স্রাব। দশদিনের অধিক হলেই গোসল করে সালাত ও সাওম সবকিছু আদায় করতে হবে।

হায়েযের হুকুম

হায়েযের সময় লাল, হলুদ, কালো, মেটে যে কোনো রং দেখা যায়, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখবে, তখন বুঝতে হবে যে, হায়েয বন্ধ হয়েছে।

৫৫ বছরের পর সাধারণত হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। এরূপরও যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে লাল, হলুদ সবুজ বা মেটে রংয়ের স্রাব দেখা দেয় তা হায়েয বলে গণ্য হবে। দুই হায়েযের মধ্যে পবিত্র অবস্থার সময়কাল কমপক্ষে ১৫ দিন।

যদি কোনো মহিলার হায়েযের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ নিয়মিত প্রতি মাসে ৪ দিন বা ৫ দিন হয়। হঠাৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যদি তার কোনো মাসে ১২ দিন স্রাব আসে তখন নির্দিষ্ট ৪/৫ দিন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং বাকি দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

কোনো মহিলার যদি অনবরত স্রাব চলতে থাকে, এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসের প্রথম দশদিন হায়েয ধরে নিয়ে বাকি দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরতে হবে। দশদিন দশরাত পর গোসল করে সালাত আদায় করতে হবে।

হায়েয অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ নয়

হায়েয আল্লাহ তাআলার এক অমোঘ বিধান। এর সাথে নারী জীবনের বহু বিষয় জড়িত। এ অবস্থায় ইসলামি শরিয়ত অনেকগুলো বিধান আরোপ করেছে। এ অবস্থায় যে সব কাজ বৈধ নয়, তা হলো–

১. হায়েয অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। তার কাযাও করতে হবে না। এ সময় সালাত আদায়ের সময়টুকু অযু করে বসে বসে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

২. হায়েয অবস্থায় যে কোনো প্রকার সাওম পালন করা নিষিদ্ধ। অবশ্য পরে ফরয সাওমের কাযা করতে হবে। নফল সাওম অবস্থায় হায়েয শুরু হলে পরে এরও কাযা আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন–

كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَ لَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে আমাদের যখন হায়েয হতো, আমাদেরকে সাওম কাযা করার আদেশ দেয়া হতো, সালাত কাযা করার আদেশ দেয়া হতো না। (সুনানু নাসায়ি)

৩. হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلَا لِجُنُبٍ.

অর্থ: ঋতুবতী মহিলা ও অপবিত্রদের মসজিদে প্রবেশ বৈধ নয়। (সহিহ বুখারি)

৪. হায়েয অবস্থায় কাবা ঘরের তাওয়াফ করা নিষেধ।

৫. এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ। হায়েয অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই অবশ্য জুযদান অথবা রুমালের সাহায্যে প্রয়োজনে কুরআন স্পর্শ করা যায়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَ لَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ.

অর্থ: অপবিত্র ও ঋতুবতী মহিলা কুরআন তেলাওয়াত করবে না। (সহিহ বুখারি)।

৬. হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন হারাম। তবে এক সাথে খানাপিনা করা, এক বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি জায়েয।

চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে হায়েয বন্ধ রাখার পরিণতি ও হুকুম

হায়েয আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ম। মেয়েদের হায়েয না হলে অথবা অনিয়মিত হলে শরীরে নানা রোগ দেখা দেয়। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা মেয়েদের সন্তান ধারণ, পেটে সন্তানের পরিচর্যা, স্বাস্থ্যের শক্তি অটুট থাকার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। যে সকল মহিলার হায়েয নিয়মিত হয় না তাদের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে হায়েয বন্ধ করা ঠিক নয়। রমযানে বিশেষ কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে হায়েয বন্ধ করা অস্বাস্থ্যকর যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নেফাসের ধারণা

নেফাস (اَلنِّفَاسُ) শব্দের অর্থ প্রসূতি অবস্থা। শরিয়তের পরিভাষায় নেফাস বলা হয়–

هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ

অর্থ : সন্তান প্রসবের পর মেয়েলোকদের যে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকে, তাকে নেফাস বলে।

(আল-ফিকহ আলা মাযাহেবে আরবাআ, ১৩১)

নেফাসের সময়কাল ঊর্ধ্বে চল্লিশ দিন আর কমের নির্দিষ্ট সীমা নেই। সন্তান প্রসবের পর যদি কোনো স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব না হয় তবুও তার গোসল করা ওয়াজিব।

নেফাসের আহকাম

নেফাস চলাকালীন সালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ, কাবাঘরের তাওয়াফ, স্বামীর সাথে মিলন নিষিদ্ধ। নেওয়ামতের শুকরিয়া জানাতে আলহামদুলিল্লাহ এবং খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা যাবে। নেফাস যদি রমযান মাসে হয় তাহলে রোযা রাখতে হবে না, তবে পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে। এ সময় সালাত আদায় করা যাবে না, সালাতের কাযাও আদায় করতে হবে না।

ইস্তেহাযার ধারণা

ইস্তেহাযা (اَلْإِسْتِحَاضَةُ) স্ত্রীলোকদের এক প্রকার রোগ।

শরিয়তের পরিভাষায় ইস্তেহাযা বলা হয়–

هِيَ سَيْلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ مِنَ الرَّحْمِ

অর্থ : হায়েয ও নেফাসের মুদ্দতের সময়ের বাইরে রক্তস্রাবকে ইস্তেহাযা বলে।

ইস্তেহাযা অবস্থায় করণীয়

হায়েয ও নেফাস অবস্থায় যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ইস্তেহাযা অবস্থায় সে সকল কাজ বৈধ। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ করা, কাবা শরিফ তওয়াফ করা, কুরআন শরিফ স্পর্শ করা, ইতেকাফ করা ইত্যাদি। ইস্তেহাযা অবস্থায় স্বামী- স্ত্রীর স্বাভাবিক কার্যক্রম বৈধ। সালাত আদায় করতে হবে। রমযান মাসে এরূপ হলে তাকে সাওম পালন করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. নেফাস অর্থ কী?

ক. প্রসূতি অবস্থা খ. সুস্থ অবস্থা
গ. প্রসব অবস্থা ঘ. বাধ্যতামূলক

২. নেফাসের সময় কাল কত?

ক. ঊর্ধ্বে ৪০ দিন খ. ঊর্ধ্বে ২১ দিন
গ. ঊর্ধ্বে ৬০ দিন ঘ. ঊর্ধ্বে ৫০ দিন

৩. হায়েয হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত বছর?

ক. ৯ খ. ১০
গ. ১২ ঘ. ১৬

৪. হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত কত?

ক. ৩ দিন ৩ রাত খ. ৫ দিন ৫ রাত
গ. ৭ দিন ৭ রাত ঘ. ১০ দিন ১০ রাত

৫. হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা কত?

ক. ৩ দিন ৩ রাত খ. ৫ দিন ৫ রাত
গ. ৭ দিন ৭ রাত ঘ. ১০ দিন ১০ রাত

৬. সাধারণত কত বছর বয়সে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়?

ক. ৫০ খ. ৫৫

গ. ৬০ ঘ. ৭০

৭. দুই হায়েযের মধ্যে পবিত্র অবস্থার সময়কাল কমপক্ষে কত দিন?

ক. ১০ খ. ১৫

গ. ১৮ ঘ. ২০

৮. নেফাসের সর্বনিম্ন সময়কাল কত দিন?

ক. ৩ খ. ১০

গ. ৪০ ঘ. নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই

৯. হায়েয-নেফাস অবস্থায় সালাতের কাযা করার বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. ইচ্ছাধীন ঘ. কাযা করবে না

১০. হায়েয-নেফাস অবস্থায় সাওমের কাযা করার বিধান কি?

ক. ফরজ খ. মুস্তাহাব

গ. জায়েজ ঘ. কাযা করবে না

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। হায়েয কাকে বলে? হায়েযের সময়কাল ও হুকুম লেখ।

২। হায়েয অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ নয়– তা বর্ণনা কর।

৩। নেফাস কাকে বলে? নেফাসের হুকুম বর্ণনা কর।

৪। ইস্তেহাযা কী? এ অবস্থায় করণীয় কী? বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

সালাত

اَلصَّلَاةُ

প্রথম পাঠ

সালাতুল জুমুআ

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

সালাতুল জুমুআ-এর পরিচিতি

اَلْجُمُعَةُ শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। পরিভাষায় শুক্রবার যোহরের ওয়াক্তে যোহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে জুমুআর সালাত বলে। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমুআর সালাত অনুষ্ঠিত হয়। জুমুআর সালাত ফরজ। অস্বীকারকারী কাফের। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে ফাসিক হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوْا الْبَيْعَ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : হে মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা মহান আল্লাহর যিকিরে দ্রুত বেরিয়ে পড় এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (সুরা জুমুআ, ৯)

জুমুআর শরয়ি মর্যাদা ও ফযিলত

জুমুআর সালাতের ফযিলত অনেক। নবি করিম (ﷺ) বলেন: 'যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য গমন করে তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল সাওম আদায় করার সওয়াব দেওয়া হয়।' (জামে তিরমিযি)

আল্লাহর প্রিয় রসুল (ﷺ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে যথাসম্ভব পাক সাফ হয়ে খুশবু লাগিয়ে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে

যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথা নিয়মে সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শুনে মহান আল্লাহ তাআলা তার বিগত জুমুআ হতে এ জুমুআ পর্যন্ত সকল গুনাহ (সগিরা) মাফ করে দিবেন।' (সহিহ বুখারি)

জুমুআর সালাত আদায় না করলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবি (ﷺ) বলেন- যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন জুমুআ ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। তার দিলকে মুনাফেকের দিলে পরিণত করে দেওয়া হয়। (তাবারানি)

জুমুআর সালাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি

জুমুআর সালাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ–

১। স্বাধীন হওয়া

২। পুরুষ হওয়া

৩। মুকিম হওয়া

৪। সুস্থ হওয়া

৫। বালেগ হওয়া

৬। সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া

৭। মুসলমান হওয়া

৮। দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন হওয়া ও

৯। চলার শক্তি থাকা

সালাতুল জুমুআ সহিহ হওয়ার শর্তাবলি

জুমুআ সহিহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে শর্তাবলি উল্লেখ করা হলো–

(১) শহর বা ছোটো শহর-তুল্য হওয়া

(২) যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে জুমুআ আদায় করা

(৩) খুতবা পাঠ করা

(৪) খুতবা সালাতের পূর্বে পড়া

(৫) খুতবা যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে

(৬) জামাত হওয়া

(৭) ইযনে আম তথা অবারিত অনুমতি থাকা

জুমুআর ফরজ সালাত ও আগে-পরের সুন্নত সালাত

জুমুআর ফরজ সালাত দুরাকাত। সকল মাযহাবের মতে জুমুআর সালাত ফরজে আইন। যোহরের সময় যতক্ষণ থাকে জুমুআর সময়ও ততক্ষণ থাকে।

জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে ঢুকে প্রথমে দুরাকাত তাহিয়্যাতুল অযু এবং দুখুলুল মসজিদ এবং সব শেষে দুরাকাত নফল পড়া যায়। জুমুআর ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত কাবলাল জুমুআ পড়া সুন্নত এবং ফরজের পরে চার রাকাত বাদাল জুমুআ পড়া সুন্নত।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন –

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) জুমুআর পূর্বে চার রাকাত এবং জুমুআর পরে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। (মুয়াত্তা, মুজামুল আওসাত, তিরমিযি, তাহাবি, মুশকিলুল আসার)

জুমুআর সালাত আদায়ের সময়, নিয়ম ও খুত্‌বা শোনার গুরুত্ব

জুমুআর দুই রাকাত সালাত ফরজ। ফরজের আগে চার রাকাত قَبْلَ الْجُمُعَةِ (কাবলাল জুমুআ) ও পরে চার রাকাত بَعْدَ الْجُمُعَةِ (বাদাল জুমুআ) সুন্নত। জুমুআর ফরজের জন্য জামাআত শর্ত। জামাত ছাড়া জুমুআ হয় না। কোনো কারণে জামাআতে শামিল হতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়।

জুমুআর জন্য দুইটি আযান দিতে হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারায়, দ্বিতীয়টি ইমাম সাহেব খুতবাহ দিতে মিম্বরে বসলে দেয়া হয়। জুমুআর দুই রাকাত ফরজের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশে মিম্বরে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দেন তাকে খুতবা বলে। খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা বা অন্য কোনো সালাত আদায় করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরয সালাত অন্যান্য ফরজ সালাতের ন্যায় আদায় করতে হয়।

খুতবা সরাসরি বক্তৃতা হতে হবে, মুসল্লিদের বোধগম্য হতে হবে, মুখস্থ বা লিখিত উভয় পদ্ধতিতেই খুতবা দেয়া যায়। খুত্‌বা হতে হবে সময়োপযোগী, যার মাধ্যমে মুসল্লিগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়। খুতবা আরবিতে পড়তে হবে, তবে নিজ নিজ মাতৃভাষায় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। খতিব হওয়ার জন্য কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও আরবি ভাষার জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। কারণ খুতবায় মুসল্লিদের প্রতি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিছু দিকনির্দেশনা থাকে। আলেম ছাড়া খুতবা দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যাতে মুসল্লিদের আমলে সমস্যা দেখা দেবে।

জুমুআর উপকারিতা

জুমুআর অনেক উপকারিতা আছে। জুমুআর সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের কুশলাদি বিনিময় করার সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

এই দিন সমাজের সর্বস্তরের লোক একত্রিত হয়ে একই কাতারে শামিল হয়ে এক ইমামের পিছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে থাকে। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়।

এদিন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيْدُ الْأُسْبُوْعِ لِلْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : জুমুআর দিন হলো মুসলমানদের জন্য সপ্তাহের ইদের দিন।

এই দিনে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসাধ্য ভালো পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা এবং মনোযোগের সাথে খুতবাহ শোনা একান্ত কর্তব্য। বস্তুত আযানের পর সাংসারিক কাজ ফেলে রেখে বিশুদ্ধচিত্তে জুমুআর সালাতে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার সুযোগ নেওয়া কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الجمعة শব্দের অর্থ কী?

ক. মসজিদে যাওয়া　　খ. একত্রিত হওয়া

গ. শুক্রবারে সালাত আদায় করা　　ঘ. পরস্পরের দেখা হওয়া

২. জুমুআ সহিহ হওয়ার শর্ত কয়টি?

ক. ৪টি　　খ. ৫টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৭টি

৩. সুস্থ, স্বাধীন, মুকিম পুরুষ মুসলমানের উপর জুমুআর সালাত আদায় করার হুকুম কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　ঘ. মুস্তাহাব

৪. জুমুআর সালাত অস্বীকারকারীকে কী বলা হয়?

ক. ফাসেক　　খ. মুশরেক

গ. মুরতাদ　　ঘ. কাফের

৫. অবহেলা করে কেউ জুমুআর সালাত আদায় না করলে কী হয়?

ক. কাফের　　খ. ফাসেক

গ. মুশরেক　　ঘ. মুরতাদ

৬. নারীদের জুমুআর সালাত আদায় করার বিধান কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. ওয়াজিব নয়　　ঘ. মাকরুহ্

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সালাতুল জুমুআ-এর পরিচয় দাও। এর শরয়ী মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণনা কর।

২। জুমুআর সালাত ওয়াজিব হওয়া ও সহিহ্ হওয়ার শর্তাবলী লেখ।

৩। জুমুআর সালাত ও আগে-পরের সালাতের হুকুম বর্ণনা কর। জুমুআর সালাতের উপকারিতা লেখ।

৪। জুমুআর সালাত আদায়ের সময়, নিয়ম ও খুতবা শোনার গুরুত্ব লেখ।

দ্বিতীয় পাঠ

সালাতুল ইদাইন

صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ

দুই ইদের সালাতের হুকুম

দুই ইদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। মাহে রমযান শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখে প্রথম তারিখে দিনের বেলায় মুসলিম জাতি ইদগাহে সমবেত হয়ে মহানন্দে ও উল্লাসে ধনী-দারিদ্র্য, আমির-ফকির, ছোটো বড়ো শিক্ষিত-অশিক্ষিত মিলিত হয়ে শোকরিয়া আদায়ের জন্য যে দুই রাকাত সালাত আদায় করা হয়, তাকে ইদুল ফিতরের সালাত বলে।

বিশ্ব মুসলিম পরম ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ যিলহজ মাসের ঐতিহাসিক দশ তারিখ, মহাসমারোহে পশু যবেহের মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে, তাই ইদুল আযহা। এ দিনে ইদুল ফিতরের মতো একই নিয়মে দুই রাকাত সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

ইদের সালাতের সময়

ইদের সালাত আদায়ের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত। তবে ইদুল ফিতর এ সময়ের মধ্যে একটু দেরি করে আদায় করা এবং ইদুল আযহার সালাত একটু সকাল সকাল আদায় করা সুন্নত। এতে ইদুল ফিতরে ফিতরা ও সদকা আদায় এবং ইদুল আযহায় কুরবানীর কাজ সমাধা করতে সুবিধা হয়।

ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা সালাত আদায়ের নিয়ম

ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার সালাত ইদগাহে মুসলমানগণ সমবেত হয়ে আদায় করে থাকে। ইদগাহ না থাকলে বা বৃষ্টির কারণে মসজিদেও ইদের সালাত আদায় করা যায়।

ইদের সালাতে আযান ও ইকামাতের কোনো বিধান নেই। ইদের মাঠে তাকবির বেশি বেশি করে পড়তে হয়। যিকির আযকার ও দুরুদ শরিফ পড়ার পর কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে ইদের সালাতের নিয়ত করতে হবে। নিয়ত আরবিতে করতেই হবে এমন নয়, বাংলায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে আরবিতে বিশুদ্ধভাবে বলতে পারা উত্তম। এতে মন সালাতের দিকে অধিক ঝুঁকে যায় ও মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইমামের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى (اَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَ مَنْ يَحْضُرُ) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ: আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ্যে কিবলামুখি দাঁড়িয়ে ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সাথে (যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত হবেন, তাদের সবার ইমাম হিসেবে) আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

মুক্তাদির নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى (اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ: কিবলামুখি দাঁড়িয়ে এই ইমামের পিছনে ইকতিদা করে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

ইদুল আযহা সালাতে উক্ত নিয়তের মধ্যে ইদুল ফিতরের স্থলে ইদুল আযহা বলতে হবে। এরপর তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বেঁধে সানা পড়তে হবে। সানা নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

এরপর ইমাম উচ্চকণ্ঠে পরপর তিনবার তাকবির বলবেন, প্রত্যেকবার আঙুলি কর্ণমূল পর্যন্ত উঠিয়ে নিচের দিকে ছেড়ে দেবেন। মুক্তাদিগণও অনুরূপ করবেন। প্রথম দুই তাকবিরে হাত ছেড়ে দিবেন, কিন্তু তৃতীয় তাকবিরের পর হাত নাভির নিচে বাঁধবেন। এরপর ইমাম সুরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সুরা বা সুরার কিছু অংশ তেলাওয়াত করে রুকু-সিজদা করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে উঠে সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা পড়ে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলবেন। এ সময়ও হাত ছেড়ে দিতে হবে। এরপর তাকবির বলে রুকু সিজদা আদায় করে সালাত সমাপ্ত করবেন। সালাম ফিরানোর পর ইমাম পরপর দুইটি খুতবা প্রদান করবেন। এ খুতবা দেওয়া সুন্নত আর শোনা ওয়াজিব। খুতবার পর দোআ-দরুদ পড়ে মুনাজাতের মাধ্যমে সালাতের পরবর্তী কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এরপর তাকবির বলতে বলতে বাড়ি ফিরবে।

তাকবির নিম্নরূপ–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

৯ যিলহজ আরাফার দিন ফজর সালাত থেকে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর উক্ত তাকবির পড়া নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ওয়াজিব। কোনো কারণে ভুলে গেলে তা মনে হওয়া মাত্র আদায় করে নিতে হবে।

ইদের সালাতের খুতবা

ইদের সালাতের খুতবা প্রদান সুন্নত। এ খুতবা শোনা জুমুআর খুতবার মতই ওয়াজিব। খুতবা চুপ করে মন লাগিয়ে শুনতে হবে। খুতবার সময় কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, সালাত আদায় করা সবই না-জায়েয। (ফতোয়ায়ে শামি ১/৬১১)

এ খুতবায় থাকতে হবে উপদেশ, থাকবে বিশ্ব পরিস্থিতি, দেশের পরিস্থিতি, মুসলিম উম্মাহর অবস্থার প্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়ের নির্দেশনা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব, আর সমাজে বিদ্যমান অনাচার চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য। যে অঞ্চলের খুতবা সে অঞ্চলের উন্নয়ন, সমস্যা-সমাধান, পরিশেষে নিজের, সমাজের, দেশের ও মুসলিম উম্মাহর জন্য থাকবে দোআ। শরিয়তের দৃষ্টিকোণে ও সামাজিক প্রয়োজনে এ খুতবার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইদের সালাতের খুতবা মাতৃভাষায় মুসল্লিদের বোঝার জন্য আলোচনা করতে হবে। মূল খুতবা আরবি ভাষায় দিতে হবে। খতিবকে কুরআন, সুন্নাহ ও আখলাকের জ্ঞানে কাঙ্ক্ষিত মানের আলেম হতে হবে, যিনি কুরআন সুন্নাহর আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম হবেন।
ইদুল ফিতরের খুতবায় সদাকাতুল ফিতর এবং ইদুল আযহার খুতবায় কুরবানি ও তাকবির তাশরিকের প্রয়োজনীয় মাসয়ালাও আলোচনা করতে হবে।

ইদুল ফিতরের দিনে সুন্নত আমল

ইদুল ফিতরের দিনে নিম্নোক্ত আমল করা সুন্নত। যথা–

১। সকাল সকাল নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া

২। মিসওয়াক করা

৩। ইদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা

৪। খুশবু ব্যবহার করা

৫। চোখে সুরমা লাগানো

৬। পবিত্র, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা

৭। ফজরের সালাতের পর যথা শীঘ্রই ইদগাহে গমন করা

৮ । সামর্থ অনুযায়ী উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা

৯ । ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন খাওয়া

১০। ইদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা

১১। ইদগাহে এক পথে যাওয়া ও অন্য পথে ফিরে আসা

১২। পায়ে হেঁটে ইদগাহে যাওয়া

১৩। ইদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা

১৪। ইদগাহে যাবার পথে চুপেচুপে তাকবিরে তশরিক পড়তে পড়তে যাওয়া। তাকবিরে তাশরিক হলো–

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

ইদুল আযহার দিনে সুন্নত আমল

ইদুল ফিতরের সুন্নতসমূহ ছাড়াও ইদুল আযহার অতিরিক্ত সুন্নত রয়েছে–

(১) ইদুল আযহার দিনে ইদগাহে যাওয়ার আগে কোনোকিছু না খাওয়া সুন্নত।

(২) ইদগাহে যাওয়ার সময় উল্লিখিত তাকবির আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে বলা সুন্নত।

(৩) সালাতের পর কুরবানি করা

ইদের সালাতের পর মুসাফাহা ও মুআনাকা

মুসাফাহা বা করমর্দন ও মুআনাকা বা কোলাকুলি ইসলামি আদবের এমন দুটি আচরণ, যা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র বাণী ও আমল দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম নবুবির মতে, الْمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ অর্থাৎ সর্বপ্রকার সাক্ষাতে মুসাফাহা করা পছন্দনীয় কাজ। মুআনাকা বা কোলাকুলি দ্বারা পারস্পরিক আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব, মহব্বত বৃদ্ধি পায়। ইদের দিনের মূল শিক্ষাই হল, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা। মুসাফাহা ও মুআনাকা একটি উত্তম কাজ ও উপকারি এবং তা করাই যুক্তিযুক্ত।

ইদের সালাতের সামাজিক প্রভাব

ইদুল ফিতর

প্রকৃত মুমিনের সিয়াম সাধনা আমিত্ব, গর্ব, বড়াই, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পাশবিক রিপুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। শবে কদরের ইবাদত, ইতেকাফের প্রশান্তি, ইদের পূর্ব রাতের দোআ কবুলের সুযোগ, তারাবিহ সালাতে কুরআনের অমীয় বাণী শুনে হৃদয় আল্লাহমুখী হয়ে

যায়। উপবাসে দুঃখী মানুষের কষ্টের অনুভব, ইফতারিতে মেহমানদারির আনন্দ, সদাকাতুল ফিতর দানে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি, সব মিলিয়ে এক নির্মল, নিষ্কলুষ মন নিয়ে, এক পবিত্র ও আনন্দঘন পরিবেশে সিয়াম পালনকারী ইদের ময়দানে হাযির হন।

প্রিয়নবি (ﷺ) তাইতো ইরশাদ করেন, ইদের সালাত সমাপনকারীরা এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ইদের মাঠ থেকে স্বগৃহে ফিরে যায়, যেন তারা নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ। কিন্তু যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও সাওম পালন করেনি, আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় ফরয তরক করতে ভয় পায়নি, এই মুবারক সময়ে ইবাদত বাদ দিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত থেকেছে, নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে, ইদের আনন্দ তার জন্য নয়, তার জন্য এদিন দুঃখের দিন, অনুতাপের দিন।

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ ، وَإِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ.

অর্থ: নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য ইদ নয়, বরং ইদ হলো যে পরকালীন শাস্তিকে ভয় করেছে তার জন্য।

এ দিন ইদের মাঠে তাদের খালেস তাওবা করা উচিত আর যেন এ ধরনের অন্যায় না হয়।

ইদুল আযহা

ইদুল আযহা বিশ্বমুসলমানের আরেকটি আনন্দের দিন। নবি হজরত ইব্রাহিম (ﷺ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একমাত্র পুত্রকে কুরবানি করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি চালিয়েছেন, মা হাজেরা তাতে সম্পূর্ণ রাজি হয়ে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে সঁপে দিয়েছেন, আর শিশু ইসমাঈল আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে জবাই হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুতির কথা ঘোষণা দিয়েছেন, ইদুল আযহা তাঁরই ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এক পুণ্যময় দিন। পশু কুরবানির সাথে সাথে নিজের নাফস তথা কুপ্রবৃত্তিকে যবাই করার এক দৃষ্টান্ত ইদুল আযহা। এর মাধ্যমে সমাজে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনের মহান শিক্ষা অর্জন করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তর লেখ

১. দুই ইদের সালাত আদায় করা কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　ঘ. মুস্তাহাব

৩. ইদগাহে ইদের সালাত আদায় না করা গেলে কোথায় আদায় করবে?

ক. ঘরে খ. বাজারে

গ. মসজিদে ঘ. মাদ্রাসায়

৪. ইদের সালাতে আযান ও ইকামতের বিধান কী?

ক. সুন্নত খ. মুস্তাহাব

গ. মোবাহ ঘ. বিধান নেই

৫. জুমুআর খুতবা শোনার হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মোবাহ

৬. তাকবিরে তাশরিক শেষ হয় জিলহজ মাসের কত তারিখ?

ক. ৯ খ. ১০

গ. ১২ ঘ. ১৩

৭. ৯ জিলহজ কোন ওয়াক্ত থেকে তাকবিরে তাশরিক শুরু হয়?

ক. ফজর খ. যোহর

গ. আসর ঘ. মাগরিব

৮. ১৩ জিলহজ কোন সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক শেষ হয়?

ক. ফজর খ. যোহর

গ. আসর ঘ. মাগরিব

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। দুই ইদের সালাতের হুকুম ও সময় বিস্তারিত লেখ।

২। ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।

৩। ইদের সালাতের খুতবার হুকুম, ধরন ও খতীবের গুণাগুন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

৪। ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার দিনে সুন্নত আমলসমূহ লেখ।

৫। সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইদের সালাতের প্রভাব বর্ণনা কর।

তৃতীয় পাঠ

সালাতুল মুসাফির

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

মুসাফিরের পরিচয় ও সফরের দূরত্ব

মুসাফির (مُسَافِرٌ) শব্দটি سَفَرٌ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ: অর্থ যিনি ভ্রমণ করেন। শরিয়তের পরিভাষায় যে ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত ভ্রমণ করার নিয়তে নিজ এলাকা থেকে বের হয় তাকে মুসাফির বলে। ফকিহগণের গবেষণায় ৫৭ মাইল বা ৯২.৫৪ কিলোমিটার সফরের নিয়ত করে ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও ১৫ দিন বা ততোধিক অবস্থানের নিয়ত না করলে মুসাফির হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক ফকিহ কমপক্ষে ৪৮ মাইল তথা ৭৭.২৮ কিলোমিটার সফর করলেই মুসাফির হিসাবে গণ্য করেন।

সফরে সালাত আদায়ে কসর (قَصْرٌ) করতে হয়। قَصْرٌ শব্দের অর্থ কম করা, সংক্ষেপ করা।

সফরে সালাতে قَصْرٌ করার হুকুম পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ

অর্থ: তোমরা যখন জমিনে সফর করবে তখন তোমাদের জন্য সালাতের কসর করায় কোন আপত্তি নেই। (সুরা নিসা, ১০১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কসরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেন–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اُمَّتَه بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوْا صَدَقَتَه.

অর্থ: এটা এমন এক বিশেষ দান, যা আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে দিয়েছেন অতএব তোমরা আল্লাহর এই দান গ্রহণ কর।

পায়ে হেঁটে বা উটে চড়ে যেতে তিনদিন তিনরাত সময় লাগে কমপক্ষে এতটুকু দূরত্ব ভ্রমণের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়ে নিজ মহল্লা অতিক্রম করলেই সে মুসাফির হবে এবং মহল্লায় ফিরে না আসা পর্যন্ত মুসাফির থাকবে। এবং তাকে কসর সালাত আদায় করতে হবে। এ দূরত্বের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে একাধারে ১৫ দিন অবস্থান করলে সেখানে সে মুকিম হবে, তাকে পুরো সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু গমনাগমন পথে কসর পড়তে হবে। একাধারে ১৫ দিনের কম কোথাও থাকার নিয়ত করলে

সে মুসাফিরই থাকবে। নিয়ত ১৫ দিনের কম কিন্তু ঘটনাক্রমে আজ যাব কাল যাব করে যদি দীর্ঘ দিনও কোথাও অবস্থান করে তবুও সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।

কসর সালাতের পদ্ধতি ও মেয়াদ

চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ সালাত দুই রাকাত পড়াকে কসর বলে।

১. কসর সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নিয়ত উল্লেখ করতে হবে। যথা যোহরের সালাতের কসর আদায় করতে হলে নিয়ত করতে হবে এভাবে–

نَوَيْتُ اَنْ اَقْصُرَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ.

অর্থ: কিবলামুখি দাড়িয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁরই নির্দেশে যোহর ওয়াক্তের ফরয চার রাকাতের স্থলে দু' রাকাত সালাত আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।

২. কেবলমাত্র চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতে কসরের বিধান রয়েছে। যেমন যোহর, আসর ও ইশার সালাত।

৩. মুসাফির ইমামতি করলে মুক্তাদিদেরকে আগেই জানিয়ে দিতে হবে। ইমাম দু'রাকাত সালাত শেষ করে সালাম ফিরালে মুক্তাদিরা সালাম না ফিরিয়ে উঠে বাকি সালাত শেষ করবেন।

৪. মুসাফির যদি মুকিম ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করতে হবে।

৫. মুসাফির সফরে থাকা অবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট কোনো কাযা সালাত যদি বাড়ি ফিরে এসে কাযা করতে হয়, তাহলে তাকে কসর আদায় করতে হবে। আর মুকিম থাকা অবস্থায় কোনো সালাতের কাযা সফরে আদায় করতে চাইলে পুরো চার রাকাতই আদায় করতে হবে।

৬. সফর অবস্থায় ভুলক্রমে দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত সালাত পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত আদায় করলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

৭. সফর অবস্থায় শান্তি, নিরাপদ ও স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নত সালাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। হাতে সময় না থাকলে বা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হলে সুন্নত পরিত্যাগ করা জায়েয। সুযোগ থাকলে নফল সালাতও আদায় করা যেতে পারে।

৮. মুসাফির ব্যক্তি যখন থেকে মুকিম হওয়ার নিয়ত করবে, তখন থেকেই পুরো সালাত আদায় করতে হবে।

লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, প্লেনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সালাতের হুকুম

লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, প্লেনে যেহেতু ভ্রাম্যমাণ এসব যানবাহনের কর্মকর্তারা যতক্ষণ সফরে থাকবেন সালাত কসর করতে হবে। যদিও বাহ্যিকভাবে তাদেরকে স্থায়ী মনে হয়। কিন্তু যানবাহন যেহেতু এক স্থানে স্থির নেই তাই তাদের প্রতি মুসাফিরের হুকুম।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তর লেখ

১. مسافر শব্দের অর্থ কী?

ক. যিনি বিদেশ থাকেন
খ. যিনি শহরে থাকেন
গ. যিনি সফর করেন
ঘ. যিনি বাহনযোগে ঘুরেন

২. قصر অর্থ কী?

ক. খাট হওয়া
খ. ছোট হওয়া
গ. কনিষ্ঠ হওয়া
ঘ. কম করা ও সংক্ষেপ করা

৩. সফরের দূরত্বের পরিমাণ কত?

ক. ৯২.৫৪ কি. মি.
খ. ৮০.১০ কি. মি.
গ. ৮২.২৮ কি. মি
ঘ. ৭৭.২৫ কি. মি.

৪. কোথাও সর্বোচ্চ কতদিন অবস্থান করলে সফর সাব্যস্ত হয় না?

ক. ২
খ. ৩
গ. ১৪
ঘ. ১৫

৫. চার রাকাত নামাজে ইমাম মুসাফির হলে মুকিম মুক্তাদি কত রাকাত সালাত আদায় করবে?

ক. ১
খ. ২
গ. ৩
ঘ. ৪

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। মুসাফিরের পরিচয় দাও এবং সফরের দূরত্ব বর্ণনা কর।

২। কসর সালাতের পদ্ধতি ও মেয়াদ বিস্তারিত লেখ।

৩। 'কসর আল্লাহর বিশেষ দান' ব্যাখ্যা কর।

৪। জাহাজ বা বিমানের কর্মচারীদের সালাতের হুকুম কী? লেখ।

চতুর্থ পাঠ

সাহু সিজদা

سَجْدَةُ السَّهْوِ

সাহু সিজদার ধারণা

اَلسَّهْوُ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো–

اَلْغَفْلَةُ وَالذُّهُوْلُ عَنِ الشَّيْءِ وَ ذَهَابُ الْقَلْبِ إِلٰى غَيْرِهِ.

অর্থ: কোনো বিষয়ে বে-খেয়াল হয়ে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া এবং অন্য দিকে মন চলে যাওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায় সাহু সাজদা হলো–

سُجُوْدُ السَّهْوِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اَنْ يَّسْجُدَ الْمُصَلِّيْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ اَنْ يُّسَلِّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَطْ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ .

অর্থ: ভুলক্রমে সালাতে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লির দুটি সিজদা দেওয়াকে سَجْدَةُ السَّهْوِ বলে। এ সিজদা করা ওয়াজিব। সাহু সিজদা শুধুমাত্র سَهْوٌ বা ভুলবশত ওয়াজিব তরক হলে আদায় করা প্রয়োজন। ইচ্ছাকৃত কেউ ওয়াজিব বাদ দিলে তার সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

সাহু সাজদা আদায় করার নিয়ম

মুসল্লি যদি সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে সালাতের কোনো ওয়াজিব তরক করে ফেলে তখন শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাবে, এরপর যথানিয়মে ২টি সিজদা দিবে এবং পুনরায় তাশাহহুদ, দরুদ শরিফ ও দোআয়ে মাসুরা পড়ে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে।

কোন সময় ও কী কারণে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব

সালাতের যে কোনো ওয়াজিব আদায় করতে ভুলে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যেমন চার রাকাত সালাতে দুই রাকাতের পর না বসলে, প্রথম বৈঠকে ভুলে দরুদ শরিফ পড়ে ফেললে, বিতরের সালাতে দোআ কুনুত পড়তে ভুলে গেলে, যোহর ও আসর সালাতে জোরে জোরে কেরাত পড়লে

সাহু সিজদা করতে হবে। তদ্রূপ মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাতে ইমাম জোরে জোরে কিরআত না পড়লে, সালাতে তেলাওয়াতে সাজদা আদায় করতে ভুলে গেলে, সাহু সিজদা দিতে হবে।

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সময় যদি ইমামের ওয়াজিব বাদ পড়ে এবং তিনিসাহু সাজদা আদায় করেন, ইমামের অনুসরণে সকল মুক্তাদিকে এ সাজদা দিতে হবে। সুরা ফাতিহার পর সুরা মিলানো ওয়াজিব। যদি কেউ সুরা ফাতিহার পর সুরা না পড়ে রুকুতে চলে যায়, অথবা সুরা ফাতিহা না পড়ে সরাসরি অন্য সুরা পড়ে রুকুতে যায়, তার উপর সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে। ইমাম হোক বা একাকী সালাত আদায়কারী হোক ভুলে দাঁড়ানোর স্থলে বসে থাকলে অথবা বসার স্থলে দাঁড়িয়ে থাকলে সাহু সিজদা করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তর লেখ

১. السهو অর্থ কী?

ক. ভুল করা খ. লোকমা দেওয়া

গ. অজান্তে কোনো কাজ বাদ দেওয়া ঘ. ভুলের সিজদা করা

২. সাহু সিজদা কখন আদায় করতে হয়?

ক. দ্বিতীয় রাকাতে খ. তৃতীয় রাকাতে

গ. চতুর্থ রাকাতে ঘ. শেষ রাকাতে তাশাহুদ পড়ার পর

৩. সাহু সিজদার মাধ্যমে কী সংশোধন করা হয়?

ক. ফরজ তরকের ভুল

খ. ওয়াজিব তরকের ভুল

গ. সুন্নত তরকের ভুল

ঘ. সবগুলো কারণে

৪. সাহু সিজদায় কয়টি সেজদা দিতে হয়?

ক. ১টি খ.২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৫. সালাতের কোন ধরনের বিধানে অনিচ্ছায় ভুল করলে সাহু সিজদা দিতে হয়?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সাহু সিজদা কী? সাহু সিজদা আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

২। কোন সময় ও কী কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব? বর্ণনা কর।

পঞ্চম পাঠ

নফল সালাত

صَلَاةُ النَّوَافِلِ

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

মানব জীবনে নফল সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ

অর্থ: বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত আমলের মধ্যে দুরাকাত (নফল) সালাতের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই। যতক্ষণ বান্দা এ সালাতে থাকে তার মাথায় নেকি পড়তেই থাকে। (জামে তিরমিযি)

নফল সালাত ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। আমাদের পরওয়ারদেগার সবকিছু জানেন। তারপরও ফেরেশতাগণকে বলবেন– দেখো তো আমার এই বান্দার সালাত কি পূর্ণাঙ্গ, না কিছু ঘাটতি আছে? যদি সালাত পূর্ণাঙ্গ থাকে, ফেরেশতা পূর্ণাঙ্গ হিসেবেই রেকর্ড করবেন। আর যদি অপূর্ণাঙ্গ থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন–দেখো এ বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি-না। যদি তার নফল সালাত থাকে, আল্লাহ তাআলা বলবেন– আমার বান্দার নফল সালাত দিয়ে ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করে দাও। এরপর তার আমল ঐ অবস্থায় ফয়সালার জন্য উত্থাপিত হবে। (মুস্তাদরাক হাকিম)।

সালাতুত তাহাজ্জুদের পরিচয় ও মর্যাদা

তাহাজ্জুদ (تَهَجُّدٌ) অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে উঠা। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে এ সালাত আদায় করা হয় বিধায় এ সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবিব (ﷺ) কে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

অর্থ: আর রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে থাকুন। এটা আপনার জন্য আল্লাহর অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও দয়া। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে)। (সুরা বনি ইসরাইল, ৭৯)

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা সুন্নত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিয়মিত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–
ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সালাত হচ্ছে রাতের তাহাজ্জুদ সালাত। (সহিহ মুসলিম)

পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে–

১। তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হওয়া নৈরাশ্য রোগ আরোগ্যের অন্যতম মাধ্যম।

২। তাহাজ্জুদ সালাত অশান্তি ও অনিদ্রার মহৌষধ।

৩। মানসিক রোগের জন্য এ সালাত অব্যর্থ ঔষধ।

৪। রগের টানা-পোড়া রোগের জন্য এ সালাত উপকারী।

৫। মস্তিষ্ক বিকৃত ও পাগলদের জন্য এ সালাত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

৬। তাহাজ্জুদ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, দেহে আনন্দ, উৎসাহ, কর্মস্পৃহা ও সীমাহীন শক্তি সঞ্চার করে।

তাহাজ্জুদ সালাত নিম্নে দুই রাকাত এবং উর্ধ্বে ৮, ১০, ১২ রাকাত। তবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) দুই দুই রাকাত করে বেশিরভাগ সময় ৮ রাকাত সালাত আদায় করতেন।
তাহাজ্জুদ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

শেষ রাতে দোআ কবুল হয়। তাই তাহাজ্জুদ সালাতের পর দোআ করা উত্তম আমল।

সালাতুত তাসবিহ

এ সালাতের ফযিলত ও মর্যাদা অনেক। এ সালাত চার রাকাত। এই চার রাকাত এক নিয়তে পড়তে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসের মর্মে জানা যায়, এই সালাতের ফযিলত অপরিসীম। আল্লাহপাক এর বিনিময়ে অশেষ সওয়াব দান করেন এবং সকল গুনাহ মাফ করে দেন। এই সালাতের নাম সালাতুত তাসবিহ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রথমে এ সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলে তাহরিমার পর সানা পাঠ করে নিম্নোক্ত তাসবিহ ১৫ বার পাঠ করবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (سُنَن التِرْمِذِي)

তারপর 'আউযুবিল্লাহি' ও 'বিসমিল্লাহি' সহ সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পাঠ করার পর ১০ বার উপর্যুক্ত দোআ পাঠ করবে। তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহর পর ১০ বার, রুকু হতে সোজা দাঁড়িয়ে ১০ বার, সাজদায় গিয়ে সাজদায় তাসবিহর পর ১০ বার, দুসিজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে সাজদায় তাসবিহর পর ১০ বার উল্লিখিত দোআ পাঠ করবে। প্রতি রাকাতে মোট ৭৫ বার উক্ত দোআ পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক রাকা'তের শুরুতে ১৫বার এর পরে উপর্যুক্ত নিয়মে ১০ বার ১০ বার উক্ত দোআ পাঠ করতে হবে। ৪ রাকাতে মোট ৩০০বার দোআটি পড়তে হবে। উল্লেখ্য যে, তাসবিহ ও দোআ পাঠকালে হাতের করে গণনা যাবে না বরং অন্তরে হিসাব রেখে সালাত আদায় করতে হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা, বায়হাকি)

সালাতুল কুসুফ ওয়াল খুসুফ

اَلْخُسُوْفُ অর্থ : দেবে যাওয়া, চন্দ্রগ্রহণ। আর اَلْكُسُوْفُ অর্থ : সূর্যগ্রহণ।

পরিভাষায়, চন্দ্রগ্রহণের সময় যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় সালাতুল খুসুফ। আর সূর্যগ্রহণের সময় যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল কুসুফ বলে। কেউ কেউ এ দুটিকে একত্রে বলেছেন,

اَلْخُسُوْفُ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ تَغَيُّرُهُمَا وَ ذَهَابُ ضَوْئِهِمَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا

অর্থ : খুসুফ হলো, সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ের পরিবর্তন এবং উভয়ের কিরণ সম্পূর্ণ বা আংশিক চলে যাওয়া। (মারেফাতুস সুনান)

খুসুফ ওয়াল কুসুফ সালাতের রাকাত সংখ্যা এবং আদায়ের নিয়ম

কুসুফ ও খুসুফের দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নত। কুসুফের সালাত জামায়াতে আদায় করা সুন্নত। খুসুফের জন্য জামায়াত সুন্নাত নয়, তবে জায়েয। এ সালাতে কোনো আযান বা ইকামত নেই।

সালাতুল কুসুফ ও খুসুফে দীর্ঘ কিরাত পড়া উত্তম। মহিলাগণ একা একা সালাত আদায় করবে। উভয় সালাতের শেষে দোআ-মুনাজাত করতে হবে। দোআয় গুনাহ মাফ ও আল্লাহর আযাব-গযব হতে নাজাতের প্রার্থনা করবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন। এদের গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেন। এর সাথে কারো জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক নেই। তোমরা যখন গ্রহণ লাগতে দেখবে তখন আল্লাহকে ডাকবে, দোআ করবে। (মেশকাতুল মাসাবীহ)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. تَهَجُّد শব্দের অর্থ কী?

ক. বিছানা ত্যাগ করা
খ. আত্মত্যাগ করা
গ. রাতজাগা
ঘ. মহব্বতের সাথে সালাত আদায় করা

২. الخسوف অর্থ কী?

ক. আলো নির্বাপিত হওয়া
খ. চন্দ্র ও সূর্যের আলো শূন্যতা
গ. সূর্যের তাপদাহ
ঘ. দেবে যাওয়া, চন্দ্রগ্রহণ

৩.الكسوف শব্দের কী?

ক. সূর্য হেলে যাওয়া
খ. সূর্য ডুবে যাওয়া
গ. চন্দ্র ও সূর্যের তেজ শূন্যতা
ঘ. সূর্যগ্রহণ

৪. নফল সালাত দ্বার ফরজ সালাতের কী হয়?

ক. সওয়াব লেখায়
খ. কাযা হয়
গ. কাযা পূরণ করে
ঘ. সবগুলো

৫. রাসুল (সা.) বেশিরভাগ সময় তাহাজ্জুদ কত রাকাত আদায় করতেন?

ক. ৬
খ. ৮
গ. ১০
ঘ. ১২

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা কর।

২। তাহাজ্জুদ সালাতের পরিচয় ও মর্যাদা বর্ণনা কর।

৩। সালাতুত তসবিহ এর ফজিলত ও পদ্ধতি লেখ।

৪। সালাতুত কুসুফ ওয়াল খুসুফ কী? ইহা আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সাওম

اَلصَّوْمُ

প্রথম পাঠ

সাওমের মাসায়েল

مَسَائِلُ الصَّوْمِ

চাঁদ দেখা

মাহে রমযানের সাওম ফরয হওয়া চাঁদ উদিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। সাওম পালন সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। একটি হলো وَقْتُ وُجُوْبٍ বা ওয়াজিব হওয়ার সময়। অপরটি وَقْتُ اَدَاءٍ বা পালন করার সময়। চাঁদ উদিত হয়েছে– তা স্বচক্ষে দেখা বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে চাঁদ উঠার সংবাদ পেয়ে গেলে সাওম পালন করা ফরজ। এ জন্য শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যাবেলায় রমযানের চাঁদ তালাশ করা মুসলমানগণের উপর ওয়াজিব। যদি চাঁদ দেখা যায়, তবে পরবর্তী দিন সাওম পালন করতে হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন গণনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ .

অর্থ: চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম শেষ করবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

(সহিহ বুখারি, মুসলিম)

চাঁদ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চোখে দেখতে হবে এবং তাহলেই সাওম পালন বা ভাঙ্গা যাবে অন্যথায় নয়– এমন কথা শরিয়তে নেই। নিজ চোখে দেখলে তা উত্তম, নিজে না দেখলেও অন্যদের নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেলে অথবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পেলে তার ভিত্তিতে সাওম পালন করতে হবে এবং সাওম ভঙ্গ করতে হবে। চাঁদ দেখার ব্যাপারে রেডিও টেলিভিশনের সংবাদ এই শর্তে গ্রহণযোগ্য হয় যে, সংবাদটি গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষ সবকিছু যাচাই করে যদি প্রচার করে থাকে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো, সাক্ষ্য দানকারী যেন সত্যবাদী, ধর্মপ্রাণ ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান হয়। চাই সে মহিলা কিংবা পুরুষ হোক।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাওয়ালের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইজন নির্ভযোগ্য পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

আত্মশুদ্ধির জন্য সাওম

সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ্য হলো, তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের সিয়াম সাধনার বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সুরা বাকারা, ১৮৩)।

আত্মিক পরিশুদ্ধি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মাৎসর্য তথা রিপুসমূহকে দমন করার জন্য এ সিয়াম সাধনা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের কলব বা আত্মাকে পূতঃপবিত্র করবে তখনই আল্লাহর বাণী আল কুরআনের নুর তার অন্তরে স্থান পাবে। রমযানের অর্থই হলো অন্তরে বিদ্যমান সকল পাশবিক স্বভাবকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে মানবিক শক্তিকে প্রবল ও সুদৃঢ় করা। ইমান ও আমলের আয়নায় বিদ্যমান ময়লা আবর্জনা সাফ করে আল্লাহর দিদার ও নৈকট্য হাসিল করার যোগ্যতা অর্জন করা। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (رحمه الله) বলেছেন, রমযানকে রমযান এ জন্য নাম রাখা হয়েছে যে–

لِأَنَّهُ يَغْسِلُ الْأَبْدَانَ مِنَ الْآثَامِ غُسْلاً وَ يُطَهِّرُ الْقُلُوْبَ تَطْهِيْرًا.

অর্থ: কেননা এ মাস মানুষের শরীরকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে এবং অন্তরকে পবিত্র করে।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভি (رحمه الله) বলেন–

সাওম শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ। কেননা সাওম ফেরেশতাশক্তিকে প্রবল ও পশুশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। আত্মার পরিশুদ্ধতা এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখার জন্য সাওমের ন্যায় উপকারি আমল কিছুই নেই।

শাওয়ালের ছয় সাওম ও তার মর্যাদা

শাওয়াল মাসে ৬টি সাওম পালন করা সুন্নত। এ সাওম শাওয়াল মাসের যে কোনো সময় রাখা যায়। এর জন্য ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়েও রাখা যায়। এ সাওমের অনেক ফযিলত হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রমযানের সাওম পালন শেষে শাওয়ালের ছয় দিন সাওম পালন করলো, সে যেন পুরো বছর সাওম পালন করলো। (সহিহ্ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ)আরো বলেন : যে ব্যক্তি রমযানের সাওম শেষে শাওয়ালের ছয়টি সাওম পালন করলো সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হলো, যেন তার মা তাকে আজই প্রসব করলো।

(সহিহ্ মুসলিম ও সুনানু আবি দাউদ)।

আশুরার সাওম

মুহাররম মাসের দশ তারিখকে ইয়াওমুল আশুরা বা আশুরার দিন বলা হয়। মক্কার কুরাইশরাও ঐ দিনে সাওম পালন করতো এবং কাবাঘরে নতুন গিলাফ লাগাতো। মহানবি (ﷺ) মদিনায় এসে দেখলেন যে, ইহুদিরাও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মুক্তির দিন হিসাবে ঐ দিন সাওম পালন করে, তখন আল্লাহর হাবিব বললেন, মুসা (ﷺ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা অধিক হকদার। এরপর নিজেও সাওম পালন করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও সাওম পালনের আদেশ দিলেন। আশুরার দিনে কেবল একটি সাওম পালন করা মাকরুহ। দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ অথবা এগার তারিখে সাওম পালন করা উচিত। এভাবে আশুরার সাওম পালনে সেদিনের ফযিলতও পাওয়া যায় এবং ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্যও হয় না। কারণ ইহুদি ও নাসারারা সম্মানিত দিন হিসেবে ঐ দিনটিতে সাওম পালন করে থাকে।

মানতের সাওম

মানতের সাওম আদায় করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে সাওম পালন করার মানত করলে সেই দিনে সাওম পালন করা ওয়াজিব। দিন নির্দিষ্ট না করলে যেদিন ইচ্ছা সেদিনই মানতের সাওম আদায় করা যায়। তবে বছরে যে পাঁচদিন সাওম আদায় করা হারাম, সে সকল দিনে মানতের সাওম পালন করা যাবে না। মানতের সাওম পালনে বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

সুন্নত ও নফল সাওম রাখার পর ভঙ্গ করা

যে সাওম নবি করিম (ﷺ) স্বয়ং আদায় করেছেন এবং করতে বলেছেন, তা সুন্নত সাওম। এ সাওম পালন করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। সুন্নত ও নফল সাওম ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত সাওম ছাড়া সব সাওমই নফল। নফল সাওম নিয়মিত পালনে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। নফল সাওম রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি লেখ

১. শাবানের চাঁদের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ তালাশ করার হুকুম কী?

ক. মুবাহ খ. সুন্নত

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ

২. সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ্য কী?

ক. উচ্চ মর্যাদা লাভ করা খ. বিপুল পরিমাণ সওয়াব হাসিল করা

গ. তাকওয়া অর্জন করা ঘ. আখেরাতে নাজাত লাভ করা

৩. আশুরার সাওম কয়টি?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৪. মানতের সাওম আদায়ের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫. নফল সাওম ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করার হুমুক কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬. রমযানের অর্থ কী?

ক. ধৈর্য শক্তির প্রকাশ করা

খ. শরীরের মেদ কমানো

গ. অন্তরের পাশবিক শক্তিকে ছাই করে মানবিক শক্তিকে প্রবল ও সুদৃঢ় করা

ঘ. শরীরের মেদ বাড়ানো

৭. ২৯ শাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখতে না পাওয়ায় পরের দিন সাওম পালন না করা শরিয়তের কোন বিধানের আওতায় পড়ে?

ক. হারাম খ. মাকরুহ

গ. মুবাহ ঘ. কোনটিই নয়

৮. ২৯ শাবান চাঁদ দেখা না গেলে করণীয় কী?

ক. শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করা

খ. বিনা প্রশ্নে সংবাদ মেনে নেওয়া

গ. রমজানের সাওম শুরু করা

ঘ. পরের দিন নফল সাওম পালন করা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. মাহে রমযানের সাওম পালনের জন্য চাঁদ দেখার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২. তাকওয়া অর্জনে সাওম এর ভূমিকা বর্ণনা করো।

৩. আশুরার সাওম-এর ফযিলত বর্ণনা করো।

৪. শাওয়ালের ছয় সাওম ও তার মর্যাদা বর্ণনা করো।

৫. মানতের সাওম আদায় করা কী? বিস্তারিত লেখ।

৬. সুন্নত ও নফল সাওম রাখার পর ভঙ্গ করলে তা আদায়ের হুকুম কী? বর্ণনা করো।

৭. রমযানের আগমনের সাথে কী কী বিষয় সম্পৃক্ত? উল্লেখ করো।

দ্বিতীয় পাঠ

ইতেকাফ ও সদাকাতুল ফিতর

اَلْاِعْتِكَافُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ

ইতেকাফের পরিচয়

ইতেকাফ (اِعْتِكَافٌ) শব্দের অর্থ اَللَّبْثُ مُطْلَقًا শুধু অবস্থান করা, কোন জিনিসকে বাধ্যতামূলকভাবে ধরে রাখা। কোন জিনিসের উপর নিজেকে শক্তভাবে আটকিয়ে রাখা। যে লোক মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাকে বলা হয় عَاكِفٌ বা مُعْتَكِفٌ অর্থ : অবস্থানকারী।

শরিয়তের পরিভাষায় ইতেকাফ বলতে বোঝায়–

اَلْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ اللَّبْثُ فِيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

অর্থ: আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে থাকা ও অবস্থান করা। কুরআন মাজিদে দুইটি আয়াতে ইতেকাফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ أَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ.

অর্থ: তোমরা হচ্ছো মসজিদসমূহে অবস্থানকারী। (সুরা বাকারা, ১৮৭)।

হজরত ইবনে আববাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত। রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইতেকাফকারী মূলত গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। তাকে ইতেকাফের বিনিময়ে এত অধিক পরিমাণ নেকি দেওয়া হবে, যেন সে সমস্ত নেকই অর্জনকারী। (ইবনে মাযা)

বস্তুত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দুনিয়ার সকল কার্যক্রম থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সর্বতোভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করাই ইতেকাফের লক্ষ্য।

ইতেকাফের প্রকারসমূহ

ইতেকাফ তিন প্রকার। যথা–

(১) ওয়াজিব,

(২) সুন্নতে মুআক্কাদা,

(৩) মুস্তাহাব।

১। ওয়াজিব ইতেকাফ : মান্নতের ইতেকাফ। যে ব্যক্তি ইতেকাফ করার মানত করবে তার উপর ইতেকাফ আদায় করা ওয়াজিব। মান্নতের ইতেকাফের জন্য সাওম পালন করা শর্ত। যদি নির্ধারিত কোন সময় বা স্থানের মানত করে, তাহলে ঐ সময় ও স্থানেই ইতেকাফ করতে হবে।

২। সুন্নতে মুআক্কাদা : মাহে রমযানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া। প্রতি মহল্লায় কমপক্ষে একজন ইতেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যদি কেউ ইতেকাফ না করে গোটা মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে।

৩। মুস্তাহাব : রমযান মাস ছাড়া অন্য যে কোনো সময় মসজিদে ইতেকাফের নিয়ত করে অবস্থান করা মুস্তাহাব। মুস্তাহাব ইতকাফে সাওম পালন করা শর্ত নয়। মুস্তাহাব ইতেকাফে নির্ধারিত কোন মেয়াদ নেই।

সদাকাতুল ফিতর

সদাকাতুল ফিতরের পরিচয়

সদাকাত (صَدَقَة) শব্দের অর্থ দান। আর اَلْفِطْرُ শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা।

পরিভাষায় সদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ) বলতে রমযান শেষে ইদ উদযাপনের দিন খাদ্য স্বরূপ নির্ধারিত সম্পদ প্রদান করাকে বোঝায়।

রমযানের সাওম সংক্রান্ত ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ হতে মুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ স্বরূপ ইসলামি শরিয়তে সদাকাতুল ফিতর এর বিধান দেওয়া হয়েছে। ধনী, ছোট, বড়, স্বাধীন, ক্রীতদাস, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর ওয়াজিব হয়। যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি সদাকাতুল ফিতরও গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর থেকে হজরত ইবনু ওমর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِّنْ تَمرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ الذَّكَرِ وَ ا لْأُنْثَى وَ الصَّغِيْرِ وَ الْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: রসুলুল্লাহ (ﷺ) সদাকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব প্রত্যেক মুসলিম, ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর অপরিহার্য করেছেন।

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

ক্রীতদাস মালের অধিকারী নয়, তাই মালিককে তার ফিতরা দিতে হবে এবং নাবালেগের ফিতরা তার অভিভাবককে দিতে হবে।

সদাকাতুল ফিতরের হুকুম

সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ইদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে আদায় করা কর্তব্য। ইদের সালাতের পর প্রদান করলে তাতে অন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ও আদায় করার সময়

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَ طَعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরার যাকাত সাওম পালনকারীকে অনর্থক, অবাঞ্ছনীয় ও নির্লজ্জতামূলক কথাবার্তা বা কাজকর্মের মলিনতা থেকে পবিত্র করা এবং মিসকিনদের উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। (সুনানু আবি দাউদ)

বস্তুত ইদুল ফিতরের দিনে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে একই কাতারে সালাত আদায়, একই মানের খাদ্যগ্রহণ করে সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে গোটা মুসলিম সমাজকে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে।

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ

সদকাতুল-ফিতর যদি গম, আটা ইত্যাদি দ্বারা আদায় করা হয়, তাহলে জনপ্রতি অর্ধ সা' পরিমাণ আদায় করতে হবে। অর্ধ সা' বা পৌনে দুই কেজি। আর যদি কিসমিস, খেজুর, আঙ্গুর দিয়ে আদায় করে তাহলে ১ সা' অর্থ : সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ আদায় করতে হবে। যদি কেউ উল্লিখিত দ্রব্য মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দান করে তাহলেও আদায় হয়ে যাবে।

যদি কোনো শিশু ইদুল ফিতরের সুবহে সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার সদকাতুল-ফিতর আদায় করাও সচ্ছল অভিভাবকের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের সুবহে সাদিকের পূর্বে ইন্তেকাল করেন, তাহলে তার সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

যাদেরকে সদাকাতুল ফিতর দেয়া যাবে

গরিব আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি ফকির, মিসকিনকে সদাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে। একজনের ফিতরা একাধিক ব্যক্তিকে আবার একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেওয়া যাবে।

যাদেরকে সদাকাতুল ফিতর দেয়া যাবে না

১. সাইয়্যেদ বংশীয় অর্থ : সত্যিকারের আওলাদে রসুল।

২. নেসাব পরিমাণ মালের মালিক।

৩. নিজ সন্তান অর্থাৎ ছেলে, নাতি ও নাতনি।

৪. নিজ পিতা, মাতা, দাদা ও দাদি।

৫. কোনো অমুসলমান ব্যক্তি বিধর্মী রাজ্যের প্রজা হলে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الاعتكاف অর্থ কী?

ক. বসবাস করা
খ. অবতরণ করা
গ. শয়ন করা
ঘ. অবস্থান করা

২. الاعتكاف কত প্রকার?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৩. صدقة অর্থ কী?

ক. উপহার
খ. দান
গ. বকশিশ
ঘ. হাদিয়া

৪. সদাকাতুল ফিতরের হুকুম কী?

ক. ফরজ
খ.ওয়াজিব
গ. সুন্নত
ঘ. মুস্তাহাব

৫. গম ও আটা দ্বারা সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কত?

ক. ১.৭৫ কেজি খ. ২.১৫ কেজি

গ. ৩.৫ কেজি ঘ. ৪ কেজি

৬. রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া ঘ. মুস্তাহাব

৭. মহল্লার মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পণ্য মসজিদে নিয়ে বিক্রি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে কী?

ক. জায়েয খ. না জায়েজ

গ. মাকরূহ ঘ. হারাম

৮. মানতের ইতেকাফ আদায় করা কী?

ক. সুন্নাত খ. মুস্তাহাব

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ

৯. মুস্তাহাব ইতেকাফের সময় কত?

ক. নির্ধারিত কোনো সময় নেই খ. ৫ দিন

গ. ৭ দিন ঘ. ১ দিন

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ইতেকাফ অর্থ কী? এর ফযিলত বর্ণনা কর।

২. ইতেকাফ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যা কর।

৩. সদাকাতুল ফিতর কী? সদাকাতুল ফিতর আদায় করা কার উপর ওয়াজিব?

৪. সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ বর্ণনা কর।

৫. সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ও আদায় করার সময় বর্ণনা কর।

৬. সদাকাতুল ফিতর কাদেরকে দেয়া যাবে না?

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত

اَلزَّكَاةُ

প্রথম পাঠ

যাকাতের আহকাম ও উপকারিতা

أَحْكَامُ الزَّكَاةِ وَفَوَائِدُهَا

যে সব সম্পদের যাকাত ফরজ

কয়েক প্রকার সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরজ, সেগুলো হলো–

(১) ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ

অথবা ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৫৩ গ্রাম রৌপ্য

অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বৎসর পর্যন্ত মালিকানায় থাকলে।

উল্লেখ্য যে, সম্পদের মূল্যের ২.৫% হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

(২) উট-গরু-ছাগল।

উট কমপক্ষে ৫টি হলে,

গরু ৩০টি হলে,

ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরজ হয়।

(৩) উৎপাদিত ফসল। যেমন: গম, যব, ছোলা, চাল, ডাল, খেজুর, আঙ্গুর, যায়তুন ইত্যাদি। কম হোক বা বেশি হোক যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য

যাকাত আদায় করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি লাভ করা। বিশেষত সম্পদ ও সম্পদের মালিককে যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র করা, বরকতময় করা এবং আখেরাতে যাকাত আদায় না করার সাজা হতে মুক্তি লাভ করা। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে যাকাত দাতা বা ধন সম্পদের মালিকের হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র হয় যাকাত দাতার চরিত্র। বিদূরিত হয় তার কার্পণ্য স্বভাব।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

যাকাত সকলকে দেওয়া যায় না। আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ: এ সদকা (যাকাত) তো ফকির-মিসকিনদের জন্য, তাদের জন্য, যারা সদাকার কাজের জন্য নিয়োজিত, তাদের জন্য, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরজ বিধান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সুরা আত তাওবাহ, ৬০)।

যাকাত গ্রহণ করতে পারবে এমন আট শ্রেণির পরিচয়

১. ফকির (اَلْفُقَرَاءُ) : যাদের সামান্য সম্পদ আছে; কিন্তু তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না।

২. মিসকিন (اَلْمَسٰكِيْنُ) : যারা নিঃস্ব, নিজের অন্নসংস্থানও করতে পারে না। অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়। কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য এবং মানবেতর জীবন যাপন করে, তারাও মিসকিনদের মধ্যে গণ্য।

৩. যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী (اَلْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا) : যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করার জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে, তাদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।

৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব (مُوَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ) : অমুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য। এ খাতটি বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে।

৫. রিকাব বা মুক্তিপণ ধার্যকৃত দাস (فِى الرِّقَابِ) : ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করলে, যাকাত ফান্ড থেকে সে অর্থ দিয়ে দাস মুক্ত করা যাবে। অথবা যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করা যাবে।

৬. গারিমিন বা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করা (اَلْغَارِمِيْنَ) : কেউ বৈধ কোনো কাজে ঋণ করে সে ঋণ শোধ করতে সক্ষম না হলে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা যাবে। অপ্রত্যাশিত কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো কারণে ব্যাবসা নষ্ট হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

৭. ফি সাবিলিল্লাহ (فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) : আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা যাবে।

৮. ইবনুস সাবিল বা পথিক (اِبْنُ السَّبِيْلِ) : মুসাফির বা প্রবাসি লোক স্বদেশে সম্পদ থাকলেও প্রবাসে যদি রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত ফরজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত হলো–

১. মুসলমান হওয়া
২. প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া
৩. সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া
৪. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া
৫. ঋণী না হওয়া
৬. পূর্ণ স্বাধীন হওয়া
৭. সম্পদ চান্দ্রমাসের হিসেবে এক বছরকাল স্থায়ী হওয়া
৮. মালিকানা পরিপূর্ণ হওয়া

যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য

যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. যাকাত একটি ফরজ ইবাদত। তা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বত্র প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে ট্যাক্স রাষ্ট্রীয় নির্দেশে আদায় করা হয়। যার পরিমাণের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে থাকে।

২. যাকাত আদায়ের ফলে সম্পূর্ণ সম্পদ পবিত্র ও বরকতময় হয়। কিন্তু ট্যাক্স হলো কর বিশেষ। তা প্রদেয় হিসেবে গণ্য কিন্তু তা যাকাতের মধ্যে গণ্য হবে না এবং তাতে সম্পদ পবিত্র হওয়ার সুযোগ নেই।

৩. যাকাত কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হয়। পক্ষান্তরে ট্যাক্স শুধুমাত্র আদায় করলেই দায়মুক্ত হওয়া যায়। তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়খাত নেই।

৪. যাকাতের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্ধারিত। কিন্তু ট্যাক্স আদায়ের জন্য অর্থের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্ধারিত নয়। বরং স্থান কাল পাত্রভেদে তা পরিবর্তিত হয়।

৫. যাকাত শুধুমাত্র ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ধার্য ও প্রদেয়। পক্ষান্তরে ট্যাক্স যেকোনো রাষ্ট্রের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী গৃহীত ও প্রদেয় হয়।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের যাকাতের বিধান

(ক) গরু-মহিষের যাকাত

৩০টি গরু-মহিষের মালিকের উপর যাকাত ফরজ। এর কম হলে যাকাত নেই।

৩০টি গরু-মহিষের জন্য গরু বা মহিষের এক বছর বয়সী একটি বাচ্চা দিতে হবে,

৪০ টি গরু-মহিষ হলে এমন দুই বছরের একটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে।

৬০টি গরু-মহিষ হলে এক বছরের দুইটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে।

৬০ এরপর প্রত্যক ৩০টি গরু-মহিষের জন্য একটি এক বছরের বাচ্চা এবং

প্রত্যক ৪০টি গরু-মহিষের জন্য একটি দুই বছরের বাচ্চা যাকাত দিতে হবে।

(খ) ভেড়া-ছাগলের যাকাত

ভেড়া বা ছাগলের সংখ্যা ৪০এর কম হলে কোনো যাকাত দিতে হবে না।

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি, ২০০ পর্যন্ত হলে দুইটি, ৩০০ পর্যন্ত হলে তিনটি, ৪০০ পর্যন্ত হলে চারটি ভেড়া/ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৪০০ এর পরের প্রতি ১০০পূর্ণ হলে প্রতি শতের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া যাকাত দিতে হবে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে যাকাতের বিধান

(ক) অলংকারের যাকাত

স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো নেসাব পরিমাণ হওয়া। সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা সমপরিমাণ টাকা একবছর পর্যন্ত জমা থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে। (আলমগিরী-১ম খণ্ড, ফাতওয়া ও মাসায়েল ইফা - ৪/৮৩)

(খ) মুদ্রার যাকাত

প্রচলিত মুদ্রা যেমন: টাকা, ডলার, পাউন্ড, ইউরো, হাতে রক্ষিত নগদ অর্থ, ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ, সঞ্চয় পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট, পুর্বের বকেয়া পাওনা ঋণ, চলতি বছরে দেওয়া ঋণ-এ সবকে নগদ অর্থের মধ্যে ধরে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। যদি তা সোনা ও রুপার নেসাবের মূল্যের সমান হয়।

(গ) ব্যবসার মালের যাকাত

ব্যবসায়ী পণ্য যে প্রকারেই হোক, যদি এর মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নেসাব পরিমাণ হয় এবং একবছর কাল স্থায়ী ও মুক্ত হয়। তাহলে পূর্ণ মালের (শতকরা ২.৫০) চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। (হেদায়া ১ম খণ্ড) বিভিন্ন প্রকারের পন্য হলে সবগুলো সমন্বিত মূল্য নেসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত আদায় করতে হবে।

(ঘ) ব্যবসার জন্য নির্মিত বাড়ির যাকাত

বিক্রির নিয়তে নির্মিত বাড়ির বিনিয়োগকৃত অর্থ হিসেব করে তার যাকাত দিতে হবে। বাড়ির বিক্রয় লব্ধ লভ্যাংশ হাতে না আসা পর্যন্ত লভ্যাংশের যাকাত দিতে হবে না।

(ঙ) শেয়ার ও বন্ডের যাকাত

শেয়ার হল বড়ো বড়ো কোম্পানির বিরাট মূলধনের অংশের উপর মালিকানা অধিকার। প্রতিটি শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেব করে সমমূল্যের হয়ে থাকে। আর বন্ড হলো ব্যাংক, কোম্পানি বা সরকার প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি বিশেষ। শেয়ারের মূল্যকে মূলধন গণ্য করে বছরান্তে যাকাত দিতে হবে। বন্ডের **আসল ও মূলধনের উপর যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। শেয়ারের ক্ষেত্রে যেদিন এক বছর পূর্ণ হবে** সেদিনের শেয়ারের মূল্য হিসাব করতে হবে।

(চ) পোল্ট্রিফার্ম ও মৎস প্রকল্পের যাকাত

পোল্ট্রিফার্ম

পোল্ট্রিফার্মের ঘর ও সরঞ্জামের উপর যাকাত নেই। মুরগী কিংবা বাচ্চা ক্রয় করার সময় যদি সেগুলোই বিক্রি করার নিয়ত থাকে তাহলে সেগুলোর মূল্যের উপর বছরান্তে যাকাত ফরজ হবে। বাচ্চা বিক্রি করার জন্য নয় বরং বাচ্চা বড়ো হয়ে ডিম ও বাচ্চা দেবে এজন্য ক্রয় করা হলে তার আয়ের উপর বছরান্তে যাকাত ফরজ হবে।

মৎস প্রকল্প

মাছ কিংবা মাছের পোনা ক্রয় করে পুকুরে ছাড়লে এগুলোর বিক্রি করার নিয়ত থাকলে এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরজ হবে। আর সেগুলোর ডিম বা পোনা বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের নিয়ত থাকলে সে ডিম বা পোনা বিক্রি লব্ধ আয়ের উপর বছরান্তে যাকাত ফরজ হবে।

(ফাতওয়া ও মাসায়েল, ইফা-৪/৯৩)

(ছ) ভাড়া দেয়া বাড়ি ও আসবাব পত্রের যাকাত

ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ি কিংবা ক্রয়কৃত বাড়ি ও দালান কোঠায় যাকাত নেই। ভাড়া বাবদ আয়ের উপর যথা নিয়মে যাকাত ফরজ হয়। আসবাবপত্রের কোনো যাকাত নেই। তবে যে সকল আসবাবপত্র ভাড়া দেওয়া হয়। যেমনঃ দোকান, গাড়ি, রিক্শা, নৌযান, ডেকোরেশনের আসবাবপত্র ইত্যাদির ভাড়ার আয়ের উপরে যাকাত ফরয হবে।

(জ) প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত

প্রভিডেন্ট ফান্ড যেহেতু স্বাধীনভাবে উত্তোলন করার সুযোগ নেই, তাই নিজের হাতে অর্থ না আসা পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না। হাতে আসলে তখন নেসাব পরিমাণের বছরান্তে যাকাত দিতে হবে।

(ঝ) ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার যাকাত

ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মালিকানা যেহেতু নিজের স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায়, তাই গচ্ছিত আমানতের যাকাত দেয়া ফরজ। ফিক্সট ডিপোজিটের টাকার যাকাত দিতে হবে। প্রতি বছর আদায় করে না থাকলে টাকা উত্তোলনের পর প্রতি বছরের হিসাব করে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

(ঞ) মেশিনারী সম্পদের যাকাত

কারখানার মেশিনারি ও আবাস গৃহের উপর যাকাত ফরজ নয়। কারখানার মেশিনারি ব্যবহার করে যে আয় হবে তাতে যাকাত ফরজ হবে।

(ট) সিকিউরিটি মানির যাকাত

সিকিউরিটি বা জামানতের সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা জমাকৃত ব্যক্তির থাকে, তাই তাতে যাকাত দিতে হবে। তবে সম্পদ হাতে আসার পূর্বেও প্রতি বছর দেওয়া যাবে। অথবা সম্পদ হাতে আসার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে। জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না।

(ঠ) হারাম মালের যাকাত

হারাম মাল যতই হোক না কেন, এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই হারাম মালের যাকাত নেই। তবে হারাম মাল যদি হালাল মালের সাথে এমনভাবে মিশে যায়, পৃথক করা প্রায় অসম্ভব এ অবস্থায় সমুদয় মালের যাকাত দিতে হবে।

(ড) অমুসলিমকে যাকাত

অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নফল খাত থেকে দান করা বৈধ।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হয়েও যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র অপবিত্রই হয় না বরং এরূপ সম্পদশালীর জন্য ভয়াবহ পরিণাম অবধারিত রয়েছে। যাকাত আদায় না করার জন্য কঠিন, কঠোর ও নির্মম পরিণতির কথা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

অর্থঃ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, তাদেরকে শুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের ললাটে, পাজর ও তাদের পৃষ্ঠদেশ। বলা হবে এই সম্পদই তা; যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সুরা তাওবা, ৩৪-৩৫)

এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ اٰتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِيْ شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ وَ أَنَا كَنْزُكَ .

অর্থঃ আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতের দিন মারাত্মক বিষধর সর্পের আকার ধারণ করবে, তার কপালের উপর দু'টি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাঁত বা দুটি শিং থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সাপকে তার গলায় প্যাঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপটি তার মুখের দুই পাশে, দুই গালের গোশত খেতে থাকবে আর বলতে থাকবে 'আমিই তোমার মাল-সম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। (সহিহ বুখারি ও সুনানু নাসায়ি)

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম যে তিনব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তার একজন হলো, যে সম্পদশালী মুসলিম যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে। যাকাত প্রদান করে না বা টালবাহানা করে এরূপ মুসলিমকে হাদিসে مَلْعُوْنٌ বা অভিশপ্ত বলা হয়েছে।

আদর্শ সমাজ গঠনে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত। যাকাত প্রদান করার জন্যে (آتُوا الزَّكٰوةَ) কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার অর্থই হল যার সম্পদ আছে তিনি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে অসহায় গরিব মিসকিনকে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে বসবাস করার সুযোগ করে দেবেন। তারা যাকাত নিতে আসবে না, বরং যাকাত দাতা নিজে গিয়ে তাদের দিয়ে আসবেন। সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ যদি কুরআন সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাকাত প্রদান করেন এবং রাষ্ট্র যদি পরিকল্পনা ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা নেয়, তাহলে যাকাত ব্যবস্থাই সকল বেকারত্ব ও অসহায়ত্ব দূর করতে সক্ষম।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি লেখ

১. স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাতের নিসাব কী?

ক. স্বর্ণ ১০ তোলা বা রৌপ্য ৭০তোলা

খ. স্বর্ণ ৮ তোলা বা রৌপ্য ৬০ তোলা

গ. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা বা রৌপ্য ৫২.৫ তোলা

ঘ. স্বর্ণ ১৫ তোলা বা রৌপ্য ৪০ তোলা

২. গরুর যাকাতের নিসাব কী?

ক. ৫টি খ. ৩০টি

গ. ৪০টি ঘ. ৪৫টি

৩. উটের যাকাতের নিসাব কী?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৭টি ঘ. ১০টি

৪. ছাগল বা ভেড়ার যাকাতের নিসাব কী?

ক. ৩০টি খ. ৩৫টি

গ. ৪০টি ঘ. ৫০টি

৫. উৎপাদিত ফসলের নিবাস কী?

ক. ৪০০ কেজি খ. ৫০০ কেজি

গ. ৬০০ কেজি ঘ. কম হোক বেশি হোক

৬. যাকাতের খাত কয়টি?

ক. ৬ খ. ৭

গ. ৮ ঘ. ৯

৭. যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্য কী?

ক. দারিদ্র্য দূর করা

খ. আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি লাভ করা

গ. সামাজিক ও আর্থিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা

ঘ. উপরের সবগুলো

৮. শরিয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের টাকা দিয়ে মুসল্লিদের যেয়াফত বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা কী?

ক. جائز খ. مستحب

গ. حرام ঘ. مكروه

৯. হারাম মালের যাকাত দেয়া কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. মুস্তাহাব ঘ. হারাম মালের যাকাত নেই

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ইসলামে যাকাতের হুকুম কী?

২. পশুর যাকাতের বিধান উল্লেখ কর।

৩. পোল্ট্রিফার্ম, মৎস প্রকল্প/বাড়ি ভাড়া ইত্যাদির যাকাতের নিয়ম কী?

৪. ব্যবসায়ী পণ্যের নিসাব নির্ধারণের পদ্ধতি লেখ।

৫. যাকাত আদায় না করার পরিণাম কী বর্ণনা কর?

৬. অলংকার, মুদ্রা ও বন্ডের যাকাত প্রদানের নিয়ম বর্ণনা কর।

৭. যাকাত আদায়ের খাতগুলি বর্ণনা করো।

৮. যে সব সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরজ তা বর্ণনা কর।

৯. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী বর্ণনা কর।

১০. আদর্শ সমাজ গঠনে যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর।

১১. যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় পাঠ
উশর
اَلْعُشْرُ

উশরের পরিচয়

উশর (عُشْرٌ) শব্দের অর্থ একদশমাংশ। অর্থাৎ দশ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ সম্পদ। পারিভাষিক অর্থে কৃষি সম্পদের যাকাতকে উশর বলা হয়। একে ফল ও ফসলের যাকাতও বলা হয়।

উশরের হুকুম

যে জমির ফসল বৃষ্টি বা নদী-নালার পানিতে স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত হয় তা থেকে ১০% হারে ফসলের যাকাত আদায় করতে হয়। উশর আদায় করা ফরয ইবাদত। আর যে জমিতে কৃত্রিমভাবে সেচ প্রয়োগ করতে হয়, তার ৫% ফসল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হয়।

উল্লেখ্য যে, ফসল বপন ও যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ফসল হতে উশর আদায় করতে হয়। যাকাত আদায় করার জন্য বলেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক ও আকেল বা সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া শর্ত, কিন্তু উশরের ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়। শিশু ও মস্তিষ্ক-বিকৃত লোকের ফসল যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাকেও উশর দিতে হবে।

উশরের নিসাব

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফসল উৎপন্ন হলেই উশর দিতে হবে। যার কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। ফসল অল্প হোক আর বেশি হোক; উৎপাদিত ফসল থেকে উশর দিতেই হবে। যেমন উশর সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

فِيْمَا سقتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ الْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَ فِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِيْ أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

অর্থ: বৃষ্টির পানি, খাল বা ঝরনার পানি হতে সিক্ত কিংবা নিজস্বভাবে সিক্ত জমির ফসলে উশর অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ ফসল ধার্য হয়েছে। আর যে কোনো সেচ ব্যবস্থার ফলে সিক্ত জমির ফসলের ক্ষেত্রে উশরের অর্ধেক তথা: শতকরা ৫ ভাগ ফসল উশর হিসেবে দিতে হবে।

(সুনানু আবি দাউদ)

উশর কোন কোন ফসল বা ফলে হবে, তা নির্ধারিত নেই। হাদিস শরিফে যব, গম, কিশমিশ ও খেজুরের কথা উল্লেখ আছে।

অন্য হাদিসে اَلذُّرَّةُ শস্য দানার কথা বলা হয়েছে। হাদিসে তৎকালে প্রচলিত শস্য ও ফলের উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তিসঙ্গত কারণে। বর্তমানে আমাদের দেশে গম, যব, চাল, শস্যদানা, তরকারি, গোলাপফুল, ইক্ষু, তরমুজ, বাংগী, শশা, খিরাই, বেগুন, শিম, আঙ্গুর , বাদাম, ধনিয়া, কলা ইত্যাদি ফসল ও ফলের উপর ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ তাআলা ফল ও ফসলের যাকাত সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ.

অর্থ: ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের অর্জিত পবিত্র সম্পদ এবং যমিন থেকে আমি তোমাদের যে ফল ফসল উৎপাদন করি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। (সুরা বাকারা- ২৬০)

ইসলামের সোনালী যুগে বিশেষ করে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর শাসনামলে যাকাত ও উশরের মাল বাইতুল মালে প্রচুর পরিমাণে জমা হয়। কিন্তু ১৯ দিন পর্যন্ত ঢোল পিটিয়েও একজন যাকাত গ্রহণকারী পাওয়া যায়নি। তারপর বিজাতীয়দের কাছে নিলামে এই সম্পদ বিক্রি করা হয়। সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু হলে যে অভাবমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বাস্তব প্রমাণ এর চেয়ে আর কী হতে পারে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি লেখ

১. عُشْرٌ অর্থ কী?

ক. দশ   খ. দশম

গ. একদশমাংশ   ঘ. দশটি বস্তু

২. উশরের নিসাব কী?

ক. নির্ধারিত নেই   খ. ৬০০ কেজি

গ. ৬৩০ কেজি   ঘ. ৬৫০ কেজি

৩. শিশু ও মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের উশর দেওয়ার হুকুম কী?

ক. ফরজ   খ. সুন্নত

গ. নাজায়েয   ঘ. মুবাহ

৪. উশর আদায়ের হুকুম কী?

ক. فرض খ. مستحب

গ. جايز ঘ. سنه

৫. উশর কাকে বলে?

ক. কৃষিপণ্যের যাকাত খ. গরু-মহিষের যাকাত

গ. ব্যবসায়ীপণ্যের যাকাত ঘ. স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. উশরের হুকুম কী? লেখ।

২. যাকাত ও উশর প্রদানে সমাজের উপকারিতা বর্ণনা কর?

৩. উশরের নিসাব বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
যবেহ ও মানত
اَلذَّبْحُ و النَّذْرُ

প্রথম পাঠ
যবেহ

যবেহ-এর পরিচয়

যবেহ (اَلذَّبْحُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. قَطْعُ الْعُرُوْقِ বা রগ কেটে দেওয়া।

২. إِجْرَاءُ الدَّمِ বা রক্ত প্রবাহিত করা।

৩. اَلشَّقُّ বা বিদীর্ণ করা।

৪. إِزْهَاقُ الْحَيْوَانِ বা প্রাণী বধ করা।

৫. اَلْجُهْدُ বা কষ্ট দেওয়া।

اَلذِّبْحُ শব্দের ذ বর্ণে كَسْرَةٌ বা যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ অর্থ : জবাইয়ের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়। যেমন আল কুরআনে হযরত ইব্রাহিম (ﷷ) এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে–

وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ: আর আমি তাকে তার পরিবর্তে দান করলাম এক মহান যবেহের জন্তু।

(সুরা সাফফাত, ১০৭)

শরিয়তের পরিভাষায় ذَبْحٌ বলা হয়–

اَنْ يَقْطَعَ الْعُرُوْقَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحَيْوَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ.

অর্থাৎ: বিসমিল্লাহ বলে প্রাণীর চারটি রগ কেটে দেওয়াকে ذَبْحٌ বা ذَبِيْحَةٌ বলে।

যবেহ এর শর্ত

১. যবেহকারী ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী হতে হবে। যেমন মুসলিম ব্যক্তি আকিদাগত দিক থেকে তাওহিদে বিশ্বাসী। ইয়াহুদি, খ্রিষ্টানগণ আহলে কিতাব হলেও বর্তমান আকিদা ও আমলের দৃষ্টিকোণে তাদের যবাইকৃত পশুপাখি না খাওয়া উত্তম। অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী বা মুরতাদ ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়।

২. যবেহকারী যবেহের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা। যে সকল জন্তু ও পাখির গোশত খাওয়া বৈধ, তা হালাল হওয়ার জন্য بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে যবেহ করা শর্ত। যবেহ করা হলে গোশত থেকে অপবিত্র রক্ত বের হয়ে যায়, আর এতে গোশত হালাল হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড)

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ .

অর্থ: তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, আঘাতে মৃত পশু, উচ্চস্থান থেকে পতনের কারণে মৃত পশু, শিংয়ের এর আঘাতে মৃত পশু,হিংস্র জানোয়ারে ভক্ষণ করা পশু,তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া যা মূর্তিপূজার বেদিতে বলি দেওয়া হয় এবং যা লটারির তীর দিয়ে বণ্টন করা হয়। এ সব পাপ কাজ। (সুরা মায়িদাহ, ৩)

উক্ত আয়াতে জবাই করা জন্তুকে হালাল করা হয়েছে।

জবাইকারী যদি মুসলমান হয়; কিন্তু ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পড়েনি অথবা অল্পবয়স্ক কিশোর; যে বিসমিল্লাহ শিখেনি তার জবাইকৃত পশু-পাখি খাওয়া হালাল হবে না। কুরআন মাজিদে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন–

وَ لَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ.

অর্থ: যে যবেহতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, তা তোমরা খাবে না, এটা পাপ।

(সুরা আনআম, ১২১)

যবেহের প্রকার

যবেহ সাধারণত দু প্রকার। যথা–

(১) ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ বা স্বাভাবিক যবাই।

(২) ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ বা জরুরী মুহূর্তের জবাই।

ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ এটা حُلْقُوْمٌ বা খাদ্যনালি এবং لَبَّةٌ বা বুকের উপর অংশের মাঝখানে হতে হবে। এতে চারটি রগের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি রগ অবশ্যই কাটা যেতে হবে। সে রগ চারটি হলো-

(১) اَلْحُلْقُوْمُ বা খাদ্যনালী, (২) اَلْمِرِّيُّ বা শ্বাসনালি, (৩) ও (৪) اَلْوَدْجَانُ বা দুটি শাহরগ।

ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ-এর জন্য কোনো স্থান নির্ধারিত নেই; বরং প্রাণীর যে কোনো স্থানে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেই ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ হয়ে যাবে। ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ তখনই জায়েয হবে, যখন যবাইকারী ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় প্রাণীর দেহের যে কোনো স্থান হতে রক্ত প্রবাহিত করতে পারলে প্রাণী হালাল হয়ে যাবে।

যবেহ করার মাসনুন তরিকা

যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা হবে, তা ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে, প্রাণীর কষ্ট কম হয় এবং রগ ভালোভাবে কেটে যায়। যেমন : ছুরি, তরবারি, কাঁচ, বাঁশের চটি, ধারালো পাথর এবং কাঠ নির্মিত ধারালো অস্ত্র। দাঁত বা নখ দ্বারা যবাই করলে জায়েয হবে না।

হজরত আদী ইবনে হাতিম (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَ رَاَيْتَ أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَّ لَيْسَ مَعَه سِكِّيْنٌ اَنْ يَّذْبَحَ بِالْمَرْوَةِ وَ شِقَّةُ الْعَصَا فَقَالَ اِمْرَارُ الدَّمِ بِمَا شِئْتَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ.

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের কেউ শিকার পেল, কিন্তু তখন তার কাছে চাকু নেই, এমতাবস্থায় সে কি শানিত পাথর বা বাঁশের চটি দিয়ে যবেহ করতে পারবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, রক্ত প্রবাহিত করবে, যে জিনিস দ্বারাই হোক এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

বন্দুক, পিস্তল, রিভলভারের গুলি দ্বারা শিকারকৃত জন্তু যবেহ করা ছাড়া হালাল হবে না।

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ বলে গলদেশে ছুরি চালাতে হবে। উটের বেলায় নহর বা বুকে ছুরি চালানো উত্তম। হলকুম, শ্বাসনালি এবং মোটা রগ দুইটির একটি। এই তিনটি কাটা গেলে যবেহ হয়ে যাবে। যবেহ করার পূর্বেই অস্ত্র ধারালো করা মুস্তাহাব।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান করা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন ভালোভাবে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে তখন সুন্দরভাবে যবেহ করবে।

ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা মাকরুহ। যবেহ করার পর রুহ বের হয়ে না যাওয়ার পর্যন্ত প্রাণীর ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া বা চামড়া ছাড়ানো মাকরুহ। পাখি যবেহ করে সাথে সাথে গরম পানিতে দিয়ে তার চামড়া ছড়ানো মাকরুহ। কারণ, পাখির ভেতরে বিদ্যমান নাপাকসমূহ গরম পানির প্রভাবে গোশতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ স্পর্শে কোনো প্রাণী মারা গেলে এর গোশত খাওয়া জায়েয নেই।

দ্বিতীয় পাঠ

মানত

মানতের পরিচয়

মানতকে আরবিতে নযর نَذْرٌ বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ মানত করা, ভয়-ভীতি দূর বা উদ্দেশ্যপূর্ণ হলে অথবা কোনো জটিল সমস্যা, অভাব বা সংকট থেকে উদ্ধার হলে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ও সংকল্প করা।

শরিয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

'আল্লাহর প্রতি সম্মান নিবেদনের লক্ষ্যে ওয়াজিব নয় এমন কোনো কাজকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া।' (কাওয়াইদুল ফিকহ)

নযর হালাল কাজ বা বস্তুতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

মানতের শর্তাবলি

১. নযর (প্রতিজ্ঞা) কারী ব্যক্তি মুমিন হতে হবে

২. যে কাজের মানত করা হয় সেটা পুণ্যময় কাজ হতে হবে। সুতরাং গুনাহ বা অন্যায় কাজের মানত করলে তা বিশুদ্ধ হবে না

৩. নির্ধারিত সময়সীমায় বৈধ নযর পূর্ণ করতে হবে

৪. মানত পূরণে অক্ষম হলে কাফফারা আদায় করতে হবে

মানতের রোকন

মানতের রোকন বা ভিত্তি হলো–

১. শরিয়ত সম্মত ক্ষেত্রে মানত করা।

২. মানতকারী সাধ্যের আওতায় মানত হওয়া।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং একমাত্র আল্লহর নামে মানত হওয়া।

যে কাজের মানত করা হবে সে কাজটি নেক কাজ হওয়ার অর্থ হলো, সেই কাজটি ইবাদতে মাকসুদাহ বা মৌলিক ইবাদত হতে হবে। যেমনঃ সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. نَذْرٌ অর্থ কী?

ক. শপথ
খ. ভয়ভীতি দূর করা
গ. মানত
ঘ. লুকিয়ে থাকা

২. মানতের রোকন কতটি?

ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

৩. اَلذَّبْحُ অর্থ কী?

ক. চামড়া কাটা
খ. পা কাটা
গ. রগ কেটে দেওয়া
ঘ. মেরে ফেলা

৪. যবেহের মধ্যে কয়টি রগ কাটতে হয়?

ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

৫. মানতকারী মানত পূরণে অক্ষম হলে করণীয় কী?

ক. মানত আদায় করতে হবে না
খ. কাফফারা আদায় করতে হবে
গ. শপথ করতে হবে
ঘ. তওবা করতে হবে

৬. মানত পূর্ণ করা কী?

ক. ফরজ
খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত
ঘ. মুস্তাহাব

৭. যবেহ কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৮. ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা কী?

ক. সুন্নাত খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ ঘ. উত্তম

৯. মুরতাদ ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরূহ ঘ. জায়েজ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. نَذْرٌ বা মানত কাকে বলে?

২. نَذْرٌ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।

৩. যবেহ এর পরিচয় দাও।

৪. যবেহ এর শর্ত বর্ণনা কর।

৫. যবেহ কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৬. যবেহ করার মাসনুন তরিকা বর্ণনা কর।

তৃতীয় ভাগ

আল আখলাক

اَلْأَخْلَاقُ

প্রথম অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ الْـحَسَنَةُ

প্রথম পাঠ

আখলাক পরিচিতি ও সর্বোত্তম আখলাক

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে আখলাক

আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ) শব্দটি 'খুলুক' (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও শিষ্টতা। আখলাকের ক্ষেত্রে ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা মানুষকে মনুষ্যত্বের, মানবাধিকারের ও মানবিকতার গুণে গুণান্বিত করতে পারে, আশরাফুল মাখলুকাত তথা সর্বোত্তম সৃষ্টির আসনে বসাতে পারে ইসলাম তারই শিক্ষা দিয়েছে।

মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে দুইটি প্রবৃত্তি বা চেতনা কাজ করে। একটি মানবিক প্রবৃত্তি, অপরটি পাশবিক প্রবৃত্তি। মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন পাশবিক শক্তিকে অবদমিত করা। এসব পাশবিক শক্তিকে অবদমিত করতে হলে প্রয়োজন এমন সব মানবিক গুণাবলি অর্জন করা, যাতে মানবিক শক্তির প্রভাবে পাশবিক শক্তিগুলো আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

শরিয়তসম্মত ও বুদ্ধি-বিবেক প্রসূত কর্ম সম্পাদনের চেতনা ও মন মানসিকতা যে সব গুণের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেগুলোকে বলা হয় اَلْأَخْلَاقُ الْـحَسَنَةُ বা উত্তম চারিত্রিক গুণ। আর শরিয়ত ও বিবেক-বুদ্ধির খেলাফ কোনো কাজ সম্পাদনের মানসিকতার মানদণ্ডে যেসব ত্রুটির কারণে প্রকাশ পায়, সেগুলোকে বলা হয় اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ বা অসচ্চরিত্র, যা মানব জীবনে কাম্য নয়।

اَلْأَخْلَاقُ الْـحَسَنَةُ বা সচ্চরিত্র বলতে বোঝায়-

اَلْخُلُقُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَصْدُرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ الْأَرَادِيَّةُ الإِخْتِيَارِيَّةُ مِنْ حَسَنَةٍ .

অর্থ: মানুষের অন্তরে এমন উত্তম ভাব বদ্ধমূল হওয়া, যার ফলে মানুষের ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন কাজগুলো উত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায়।

মানব জীবনে আখলাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন আখলাকে হাসানার উপর নির্ভরশীল, তেমনি তার পারলৌকিক সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা এর উপর নির্ভরশীল।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

অর্থ: তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আখলাকে হাসানা বলতে এমন বিশেষ গুণাবলিকে বোঝায়, যেসব গুণ মানুষের মাঝে উদ্ভাসিত হলে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আখলাক

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বদিক থেকে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব চরিত্রগুণে তিনি জিন, ইনসানের অনুকরণীয় আদর্শ, তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। মহান আল্লাহ তাআলা যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সনদ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : নিশ্চিতভাবে আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী। (সুরা আলকলম, ৪)

প্রিয়নবি (ﷺ) ছিলেন চলন্ত কুরআন। কুরআনই ছিল তার চরিত্র। হজরত সাদ ইবনে হিশাম (رضي الله عنه) উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (رضي الله عنها) কে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান, 'আমাদেরকে রসুল (ﷺ) এর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন।' জবাবে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন–

أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ 'তুমি কি কুরআন পড়ো না' ?

সাহাবি জবাবে বললেন 'হ্যাঁ'। মা আয়েশা বলেন– كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن

অর্থ : তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। অর্থাৎ কুরআন মাজিদে যে সকল উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার উল্লেখ রয়েছে, সে সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

প্রিয়নবি (ﷺ) হলেন সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বতভাবে সফল মহামানব। যিনি ধর্মে, কর্মে, ইহজীবনে, পর জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সংস্কার সাধনে, জ্ঞান, পুণ্যে-প্রেমে, বীরত্বে, সৎ-সাহসে, সংযমে,

ত্যাগে, সাবলম্বনে, সততায়, সত্যবাদিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, উদারতায়, ক্ষমায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, বিনয়ে, বিশ্বস্ততায়, সেবায় , সহানুভূতিতে, ভক্তিতে, বদান্যতায়, শ্রমের মর্যাদায়, জীবে দয়ায়, সাম্য স্থাপনে, নারীজাতির উন্নয়নে, সদব্যবহার, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা জীবনের সকল পর্যায়ে তিনি আদর্শ ও মডেল হিসাবে জগতকে রহমতের ছায়াতলে এনেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়ে ছিলেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সুরা আলে ইমরান, ১৫৯)

প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর চরিত্রের একটি দিক ছিল– তিনি সবার আগে সালাম দিতেন। হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি দশ বছর প্রিয়নবি (ﷺ) এর খেদমতে ছিলাম। এ দশ বছরে একবারও হুযুরকে আগে সালাম দিতে পারিনি। তিনি আরো বলেন, আমি কোনো মেশক বা আতরকে হুজুরের শরীরের ঘামের চেয়ে খুশবুদার পাইনি। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

দয়া ছিল প্রিয়নবি (ﷺ) এর চরিত্রের ভূষণ। মানুষ, জিন, পশু-পাখি সবাই তার দয়া ও মায়ায় ধন্য হয়েছে। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন–

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

অর্থ : যে দয়া করে না সে দয়া পায় না। (সহিহ বুখারি)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বলেন–

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اِشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো খাবারের দোষ বলতেন না। পছন্দ হলে খেতেন অন্যথায় রেখে দিতেন। (সহিহ বুখারি)

প্রিয়নবি (ﷺ) ছিলেন লজ্জাশীল। যে জিনিসই তার কাছে চাওয়া হতো, তিনি তা দিয়ে দিতেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, রোগীর সেবা, আতিথেয়তা, আমানত রক্ষায় তিনি ছিলেন সবার সেরা। এক কথায় বলা যায়, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য উন্নত আদর্শ ও চরিত্রের মডেল ছিলেন তিনি। নিজেই বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ: আমি তো প্রেরিতই হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য। (কানযুল উম্মাল, ২/৫)

তাই আমাদেরকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে দয়াল নবি (ﷺ)-এর অনুসরণ আবশ্যক।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ অর্থ কী?

ক. অসৎ চরিত্র
খ. অসৎ সঙ্গ
গ. অসৎ দিক
ঘ. অসৎ কথা

২. প্রিয়নবি (ﷺ)-এর চরিত্র কী ছিল?

ক. কুরআন মাজিদ
খ. হাদিস
গ. ইজমা
ঘ. কিয়াস

৩. আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য কে নির্দেশ দেন?

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
খ. রসুল (ﷺ)
গ. সাহাবায়ে কেরাম
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৪. মুহাম্মদ (স.) এর খাদেম কে ছিলেন?

ক. আবু মুসা (রা)
খ. আনাস (রা)
গ. আমর (রা)
ঘ. যুবায়ের (রা)

৫. "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ" কে বলেছিলেন?

ক. খাদিজা (রা)
খ. হাফসা (রা)
গ. আয়েশা (রা)
ঘ. ফাতেমা (রা)

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. خُلُقٌ অর্থ কী? ইসলামে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. আখলাকে হাসানা বলতে কী বুঝ? বর্ণনা কর।

৩. "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" এর ব্যাখ্যা কর।

৪. "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" এর ব্যাখ্যা কর।

৫. "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا" এর ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি

তাকওয়া (اَلتَّقْوٰى)

তাকওয়া (اَلتَّقْوٰى) অর্থ : আল্লাহর ভয়, পরহেজগারি, দীনদারি, সংযমি। শরিয়তের পরিভাষায়–

حِفْظُ اَلنَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ

অর্থ : যার দ্বারা গুনাহ্ হয় এমন কথা, কাজ থেকে নিজ আত্মাকে মুক্ত রাখা। (আলমুফরাদাত)

আল কুরআনে তাকওয়া পরিভাষাটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে –

(১) اَلْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ ভয়ভীতি।

(২) اَلْعِبَادَاتُ বন্দেগি।

(৩) تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ পাপ বর্জন করা।

(৪) اَلتَّوْحِيْدُ একত্ববাদ।

(৫) اَلْإِخْلَاصُ কথা ও কাজে নিষ্ঠা।

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা আলে ইমরান, ১০২)

তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের মূল শক্তি হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার মূলকথাই হলো–

اَلِامْتِثَالُ بِأَوَامِرِ اللهِ وَالْإِجْتِنَابِ عَنْ نَوَاهِيْهِ

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলার আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকা।

আল্লাহ্ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন। (সুরা তাওবা, ৪)

মুত্তাকিগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট সম্মানি। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার। (সুরা হুজুরাত, ১৩)

বিদায় হজের ভাষণে প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا إِذَا أَمْرُكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

অর্থ : তোমার রবকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, রমযানে সাওম পালন কর; মালের যাকাত আদায় কর, নেতার আনুগত্য কর, বিনিময়ে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।

(জামে তিরমিযি)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

اَلتَّقْوَى هُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ، وَالرِّضَا بِالْقَلِيْلِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ.

অর্থ : তাকওয়া হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী আমল করা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিদায় দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (দালিলুস সায়েলিন, ১১৪)

তাওয়াক্কুল (اَلتَّوَكُّلُ)

তাওয়াক্কুল (اَلتَّوَكُّلُ) অর্থ আল্লাহর উপর নির্ভরতা। তাওয়াক্কুল বলতে বোঝায়–

إِظْهَارُ الْعَجْزِ فِي الْأَمْرِ وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِكَ

অর্থ : কোনো কাজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং অন্যের উপর নির্ভর করা। (নুদরা-৪/১৩৭৭)

শরিয়তের পরিভাষায়–

صِدقُ اِعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

অর্থ : মহান আল্লাহর উপর অন্তরের নির্ভেজাল আস্থা স্থাপন করা। (নুদরা-৪/১৩৭৮)

যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাওয়াক্কুল সে সবগুলোর মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাওয়াক্কুল অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হও। (সুরা মায়েদা, ২৩)

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(সুরা তালাক, ৩)

আল্লাহ তাআলার প্রতি যে রূপ তাওয়াক্কুল করা উচিত তোমরা যদি তাঁর প্রতি সেরূপ তাওয়াক্কুল করতে পার, তাহলে তিনি তোমাদের রিযিক দান করবেন, যেমন পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকালে খালিপেটে নিজ অবস্থান থেকে বেরিয়ে যায় এবং দিনশেষে পূর্ণ উদরে তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

কোনো চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থেকে সব আল্লাহ করে দেবেন এ বিশ্বাস নিয়ে থাকা তাওয়াক্কুল নয়। তাওয়াক্কুল হলো সকল প্রকার উপায় উপকরণ ব্যবহার করে চেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে ফলাফল ভালো হওয়ার জন্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া ইমানের অঙ্গ।

শোকর (اَلشُّكْرُ)

শোকর (اَلشُّكْرُ) অর্থ কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানানো। اَلشُّكْرُ تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ وَ اِظْهَارِهَا তথা শোকর নেয়ামতের স্বীকৃতি ও প্রকাশ করা। পারিভাষিক অর্থে শোকর বলতে বোঝায়–

هُوَ الْاِعْتِرَافُ بِنِعْمَةِ الْمُنْعِمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوْعِ.

অর্থ : নেয়ামতদানকারীর নেয়ামতকে বিনয়ের সাথে স্বীকার করাকে শোকর বলে।

(নুদরা, ৬/২৩৯৪)

অনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয়, মুখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদান করাকে শোকর বলে।

নেয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অর্থ : আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর আমার শুক্‌রিয়া আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সুরা বাকারা, ১৫২)

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অর্থ : যদি তোমরা শোকরগুযারি হও,অবশ্যই আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও নিশ্চিত আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন। (সুরা ইবরাহিম, ৭)

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যেভাবে জরুরি, মানুষের দ্বারা উপকৃত হলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাকে ধন্যবাদ জানানো তেমনি আবশ্যক। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

অর্থ : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। (আবু দাউদ ও তিরমিযি)
শোকরের মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অধিক নেয়ামত লাভের সুযোগ হয় অনুরূপভাবে কোনো মানুষের উপকারে সন্তুষ্ট হয়ে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টি হয়। তাই খাওয়ার শুরুতে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

এবং খাওয়া শেষ করে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

এই শোকরিয়া দোআ পড়ে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

সদাচার (حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য আবশ্যক পারস্পরিক সুসম্পর্ক। আর এ সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য আবশ্যক সদ্ব্যবহারের লেনদেন ও পারস্পরিক মেলামেশা, যদি ব্যবহার কথা-বার্তা মার্জিত ও সুন্দর হয় তাহলে সে ব্যক্তি সকলের নিকট গ্রহণীয় ও বরেণ্য হয়।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ) স্বয়ং ছিলেন সদ্ব্যবহারের উপমা স্বরূপ। তাঁর সুন্দর আচরণে ও উত্তম কথায় ধনী-দরিদ্র, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সকলে মুগ্ধ হতো। তাঁর সান্নিধ্য পেতে সকলে অধীর আগ্রহী হতো। তিনি ইরশাদ করেন–

مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: যে ব্যক্তি আমাদের ছোটোদের প্রতি স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহিহ বুখারি)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ حُرِمَ عَنِ الرِّفْقِ حُرِمَ عَنِ الْخَيْرِ كُلِّهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি নম্রতা হতে বঞ্চিত সে সকল মঙ্গল হতে বঞ্চিত। (মিশকাত শরীফ)।

তাই সুন্দর ব্যবহার ও নম্র আচরণে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে এবং বন্ধুত্বের দিগন্ত প্রসারিত হয়। অন্যথায় সামাজিক ও পারস্পরিক শান্তি বিঘ্নিত হয়।

ওয়াদা পালন (اَلْوَعْدُ)

ওয়াদা পালন একজন মানুষের অন্যতম গুণ। এর দ্বারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের কাছে মানুষ সমাদৃত হয়। ওয়াদা পালন করার ফলে বিপদে আপদে মানুষের সহায়তা ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। ওয়াদা পালনকে আল্লাহ তাঁর একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاً.

অর্থ: আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কথার মধ্যে আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে?

ওয়াদা রক্ষা করা নবি রসুলগণের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিচয় দিয়ে কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا

অর্থ: তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন প্রেরিত নবি।

(সুরা মারইয়াম, ৫৪)

ধৈর্য (اَلصَّبْرُ)

ধৈর্য বা সবর (صَبْرٌ) শব্দের অর্থ অবিচল থাকা, ধৈর্যধারণ করা। শরিয়তের পরিভাষায়–

اَلصَّبْرُ هُوَ حَبَسُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَهُ

অর্থ : অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর নফসকে বেঁধে রাখা।

সবর ইবাদতের মূল। কেননা সবর না থাকলে ইবাদত করা সম্ভব নয়। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা সবরকারীদেরকে ভালবাসেন।

বিপদ, আপদ, বালা মুসিবতে ধৈর্য-ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ তাআলা এগুলো থেকে মুক্তি দেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

অর্থ : ধৈর্য থেকে অধিক ভালো ও ব্যাপক দান আর হতে পারে না। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে –

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার হিসাবের উর্ধ্বে।

হজরত আলি (ﷺ) বলেন : দেহের মধ্যে মাথার গুরুত্ব যেমন, ইমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক তেমন।

আমানত রক্ষা (الْأَمَانَةُ)

আমানত (الْأَمَانَةُ) অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা, নির্বিঘ্নে রাখা, নষ্ট হতে না দেওয়া ইত্যাদি। সম্পদ বা কোনো বস্তুকে যদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়, তা ধ্বংস না করা হয় তাহলে তাকে আমানত বলে। আর এ আমানত রাখার প্রক্রিয়াকে আমানতদারি বলা হয়।

ইসলামে আমানতদারির গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.

অর্থ: আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

(সুরা নিসা, ৫)

কুরআন মাজিদে প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলির কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

অর্থ: এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

(সুরা মুমিন, ৮ ও সুরা মাআরিজ, ৩২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) শ্রেষ্ঠ আমানতদার ছিলেন। ইসলাম প্রকাশের পূর্বে জাহেলী যুগেও তিনি শ্রেষ্ঠ আমানতদার হিসেবে সকলের নিকট আল-আমিন (الْأَمِيْنُ) বা একমাত্র বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। চরম শত্রু মক্কার কাফিররাই তাকে এ উপাধি দিয়েছিল।

তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

অর্থ: যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই। আর যে অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই। (বায়হাকী-মিশকাত)

আমানতদারি একটি সৎ ও মহৎ গুণ। কারো প্রয়োজনে সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা সংরক্ষণ করা এবং চাহিদা মতো ফেরত দেওয়া আমানতদারি। আমানতে খিয়ানত সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, শান্তি, নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে। আমানতদারি থাকতে হবে কথায়, কাজে, লেনদেনে, আচার-আচরণে, বিচার-প্রশাসনে তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

আল্লাহ তাআলা যাকে যে দেশে জন্ম নেওয়া মঞ্জুর করেছেন সে সেখানে জন্মেছে। তাই দেশ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত উপহার। জন্মভূমির কোলেই মানুষ লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়। এর পানি, মাটি, আলো-বাতাসের অবদান দেহের পরতে পরতে দেদীপ্যমান। তাই স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। আর সে কর্তব্য হলো, দেশকে ভালোবাসা।

দেশকে ভালোবাসার অর্থ- দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নতি-সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য- সংস্কৃতিতে সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার বুকে নিজ দেশকে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার সাধনা অব্যাহত রাখা। দেশকে ভালোবাসার অর্থ- দেশের মাটির সঙ্গে মানুষকে ভালোবাসা।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে রজব হাম্বলী (رحمه الله) তার রচিত জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে বলেন–

حُبُّ اَلْوَطَنْ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

মনীষীর এ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।যে মাটি ও মানুষকে ভালোবাসে না সে আল্লাহকেও ভালোবাসে না। দেশের আলো, বাতাস, ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকবে অথচ আল্লাহর দেয়া এই জমিনকে অবজ্ঞা করবে, তা হতে পারে না।বিদেশের মাটিতে যখনই নিজ দেশের পতাকা দেখে,দেশের কোনো ভালো সংবাদ শুনে প্রবাসীরা খুশিতে নেচে উঠে। দেশপ্রেমই জাগাতে পারে মনে বিশ্বপ্রেম, রসুলপ্রেম, আল্লাহ প্রেম। প্রিয়নবি (ﷺ) মানবজাতিকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন। হিজরতের সময় বারবার মক্কার দিকে ফিরে ফিরে চোখের পানি ফেলেছেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হওয়া। দেশপ্রেম দেশের উন্নয়নের চাবি কাঠি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. তাকওয়া অর্থ কী?

ক. সংযমী খ. সাহসী

গ. সংগ্রহ ঘ. সুন্দর

২. আল কুরআনে তাকওয়া পরিভাষাটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

৩. নেআমতকে বিনয়ের সাথে স্বীকার করাকে কী বলে?

ক. হাম্দ খ. শোকর

গ. সানা ঘ. মাদহ্

৪. ওয়াদা খেলাফ ও দুর্ব্যবহার করা কীসের বিপরীত?

ক. কুরআন খ. হাদিস

গ. কুরআন ও হাদিস ঘ. ইহসান

৫. "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ" এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর খ. নবির

গ. মণীষীর ঘ. কবির

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। তাকওয়া অর্থ কী ? ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব বর্ণনা কর।

২। তাওয়াক্কুল অর্থ কী ? এর ফযিলত বর্ণনা কর।

৩। শোকর বলতে কী বুঝায় ? শোকর সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

৪। সামাজিক জীবনে সদাচারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫। আমানত অর্থ কী ? কুরআন ও হাদিসের আলোকে লেখ।

৬। "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ" ব্যাখ্যা কর।

৭। টীকা লেখ-

ক. الوعد

খ. الصبر

তৃতীয় পাঠ
আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি

পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
(اِحْتِرَامُ الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ)

পবিত্র স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তির ইমান ও উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক। পবিত্র স্থানের মধ্যে রয়েছে : আল্লাহর ঘর (بَيْتُ اللهِ) বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববি (اَلْمَسْجِدُ النَّبَوِي) রওযা শরিফ, মসজিদুল আক্সা (اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى) যা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম শহরে অবস্থিত। বেথেলহাম ইসা (ﷺ) এর জন্মস্থান। মক্কা ও মদিনা তায়্যিবার ঐ সমস্ত পবিত্র স্থান, যেগুলোর সাথে প্রিয়নবি, সাহাবা, অলি-আউলিয়া ও শহিদানের স্মৃতি মিশে আছে। এ ছাড়াও যেসব ইমাম, ওলিগণের অনন্য অবদানে আমরা মুসলমান, বিশ্বের ইতিহাস সমৃদ্ধ তাদের মাযার শরিফ, স্মৃতিময় স্থানগুলো মুমিনের হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এ সকল স্থানের যিয়ারত মানুষের ইমানকে তাজা করে। অলি-আউলিয়াদের স্মৃতিময় স্থানে গেলে সালেহিনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে, এ সকল পবিত্র স্থানে কোনো গর্হিত ও শরিয়ত-বিরোধী কার্যকলাপ হলে তা বন্ধ করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র স্থানসমূহের তা'যিম, সম্মানের গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থ : আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ের সঞ্চারিত হয়। (সুরা হজ, ৩২)

তাই, আমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মন দিয়ে দেখব এবং সেগুলোকে তা'যিম করে তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হব।

নারীর অধিকার

(حُقُوْقُ النِّسَاءِ)

নারী-পুরুষ মিলেই মানবজাতি। নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কেউ অবহেলিত নয়, তুচ্ছ নয়। পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি নারীরও অধিকার আছে। মহান আল্লাহ একথা কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : তাদেরও তেমনি অধিকার আছে, যেমন তোমাদের আছে তাদের উপর। (সুরা বাকারা, ২২৮)

কিন্তু যুগেযুগে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ধর্মে নারীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে নারী হয়েছে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। বিশ্বনবি (ﷺ)-এর আবির্ভাবকালে আরব সমাজে নারী ছিল চরম অবজ্ঞার শিকার। তাঁরা ছিল অধিকার বঞ্চিত। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে মনে করা হত লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার। তাই নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কুপ্রথাও সমাজে প্রচলিত ছিল। এই জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মধ্যেই ইসলামের আবির্ভাব হয়।

ইসলাম হচ্ছে মানবতার মুক্তির সনদ। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম নারীকে কন্যা, মাতা, স্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ এক হলেও দৈহিক গঠনে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্যে সর্বক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র এক নয়। তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে সুখের সংসার ও সুখী পরিবার।

উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়ার অধিকারী, যাদের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সে তালিকায় পুরুষের সংখ্যা যেখানে ৪জন, নারীর সংখ্যা ৮জন। একজন নারী বিবাহের সময় পারিবারিক মর্যাদা (Status) অনুসারে মোহরের মালিক হয়। আর্থিক মালিকানার এ সুযোগ পুরুষের নেই। পাশাপাশি মা-বাবার সম্পত্তি থেকে ভাইয়ের সাথে ২:১ অনুপাতে এবং ভাই না থাকলে অর্ধেক (এক মেয়ের ক্ষেত্রে) বা দুই তৃতীয়াংশ (একাধিক মেয়ের ক্ষেত্রে) সম্পদেও মালিক হয় নারী। স্বামীর সম্পদেও তার অধিকার স্বীকৃত। বড়ো মানের এ তিনটি খাতে ইসলাম নারীকে নিরঙ্কুশ মালিকানা দিয়েছে।

বিপরীত পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের এক শতাংশ দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। পারিবারিক শতভাগ দায়িত্ব স্বামীর। নারী-পুরুষের মালিকানা ও দায়িত্বের গাণিতিক হিসাব ইসলাম নারীকে যে সুবিধা প্রদান করেছে, তা সর্বকুলের জন্য অনন্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রশ্নাতীত। উপরন্তু ব্যক্তিগত উপার্জনের ক্ষেত্রে আল কুরআন ঘোষণা করেছে–

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থ : পুরুষের উপার্জন পুরুষের এবং নারীর উপার্জন নারীর।

পর্দা পালন

اَلْحِجَابُ

পর্দা বা حِجَابٌ নারীজাতির ভূষণ ও নারীর নারীত্বের রক্ষাকবচ। حِجَابٌ শব্দের অর্থ হলো اَلسَّتْرُ বা اَلسَّاتِرُ অর্থ مَا اُحْتُجِبَ بِهِ যা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়।

পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন –

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

অর্থ : মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন সাধারণ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাক প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। (সুরা নুর, ৩১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন –

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

অর্থ : তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। (সুরা আহযাব, ৫৯)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের আলোকে শরিয়তের পরিভাষায় পর্দা হচ্ছে নারীর ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, দুই হাত ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখা।

আর পুরুষের ক্ষেত্রে নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

হজরত ইবনে ওমর (ﷺ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন –

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তাঁর কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। তখন উম্মে সালমা (ﷺ) বলেন, তাহলে মেয়েরা তাদের আঁচলকে কী করবে? তিনি বলেন, এক বিঘত নিচে নামিয়ে দিবে। উম্মে সালমা (ﷺ) আবার বলেন; তাহলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন; তাহলে একহাত নিচে ঝুলিয়ে পরবে; এর বেশি নয়। (জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ী)

মহিলার শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে তার পরিধেয় বস্ত্রও আবৃত রাখা, এটা পর্দার সর্বোচ্চ স্তর। শরিয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে তাদেরকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

অর্থ : এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলিযুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সুরা আহযাব, ৩৩)

অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (ﷺ) রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হুযরায় আসলে প্রিয় নবি (ﷺ) উম্মে সালমা ও মায়মুনা (ﷺ) কে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযি ও আহমদ)

মসজিদের আদব

(آدَابُ الْمَسْجِدِ)

মসজিদ হলো رِيَاضُ الْجَنَّةِ বা জান্নাতের বাগান ও আল্লাহর ঘর। মসজিদকে সম্মান করা ইমানের দাবি। মসজিদে আগমন, প্রস্থান ও অবস্থানের জন্য কিছু আদব রক্ষা করা আবশ্যক। যেমন–

(১) মসজিদ আল্লাহর ঘর হিসেবে মনের আকর্ষণ সবসময় মসজিদের সাথে রাখতে হবে। প্রিয় নবি (ﷺ) বলেন–

رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ

অর্থ : যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, সে আরশের নিচে ছায়া পাবে। (সহিহ বুখারি)

(২) মসজিদে ঢুকতে ডান পা দিয়ে ঢুকতে হবে এবং বলতে হবে–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : আল্লাহর নামে দরুদ ও সালাম রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি। হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। (মিশকাত, ৭০)

(৩) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হওয়ার সময় পড়তে হবে–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : আল্লাহর নামে; দরুদ ও সালাম রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি। হে আল্লাহ আমি আপনার অনুগ্রহ চাই। (মেশকাত, ৭০)

(৪) মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম) এ দুই রাকাত সালাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়।

(৫) মসজিদকে পবিত্র রাখা, কোনো প্রকার দুর্গন্ধ যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। রসুন, পেয়াজ জাতীয় কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া। শরীর বা কাপড় দুর্গন্ধযুক্ত হলে বা পূর্ণ পবিত্র না হলে মসজিদে প্রবেশ না করা। বাজার,হোটেল বা আড্ডাখানার মতো মসজিদ নোংরা পরিবেশ না করা। বিশেষ প্রয়োজন না হলে মসজিদে না শোয়া। মসজিদে বাজারের মতো বেচা-কেনা না করা।

২০২৫

(৬) মসজিদে খুতবা ও সালাত আদায় করা ছাড়া বাকি সময় নিম্নের তাসবিহ পড়া–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، اللهُ أَكْبَرُ

(৭) জুমুআর খুতবা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা।

(৮) অন্যের সালাতের অসুবিধা হতে পারে এমন কথা না বলা ও কাজ না করা।

(৯) বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তেগফার করা ও দরুদ শরিফ পড়া ও প্রিয় নবি (ﷺ)-কে সালাম দেওয়া।

(১০) বড়োদের সম্মান করে সামনের কাতারে স্থান দেওয়া, নিজে পেছনে সরে আসা।

(১১) মসজিদে অবস্থানকালীন নফল ইতেকাফের নিয়তে থাকা।

কথার আদব

(آدَابُ الْكَلَامِ)

মানুষের কথা বলার শক্তি পরম করুণাময় আল্লাহর এক অপূর্ব নেআমত। কথার দ্বারাই মানুষ সম্মানিত হয় আবার কথার দ্বারাই মানুষ অপমানিত হয়। মানুষ মুখ দিয়ে যে শব্দই বের করবে আল্লাহ তাআলা তা হুবহু সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ : মানুষ যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সুরা কাফ, ১৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

কথা বলার আদব অনেক। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপস্থাপিত হলো–

(১) কথা হতে হবে বিশুদ্ধ ভাষায়।

(২) সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে কথা বলবে, আর যখনই কথা বলবে, কাজের কথা বলবে।

(৪) কথা বলার সময় শালীনতা, নম্রতা ও মুচকি হাসির সাথে মিষ্টি কথা বলবে।

এত ক্ষীণ আওয়াজে বলবে না যে, শ্রোতা তা বুঝতে পারে না, আবার এমন কর্কশ আওয়াজে চিৎকার দিয়েও বলবে না; যাতে ব্যক্তির কষ্ট হয়।

(৫) অশ্লীল, গিবত, অপবাদ, অভিশাপ দিয়ে কথা বলা গর্হিত কাজ। এ সকল বদভ্যাস পরিহার করতে হবে।

(৬) স্থান, কাল, পাত্রভেদে কথা বলতে হবে। তবে সত্য কথাই বলতে হবে।

(৭) কথার দ্বারা কারও উপকার করতে না পারলেও কারও যেন ক্ষতি না হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. حِجَابٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. ঢেকে রাখা খ. আচ্ছন্ন করা
গ. সম্মুখে থাকা ঘ. ছায়া ফেলা

২. ইসলামি শরিয়তে পর্দার স্তর কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাস করে তার কী করা উচিত?

ক. নিম্ন স্বরে কথা বলা
খ. মধ্যম স্বরে কথা বলা
গ. উচ্চ স্বরে কথা বলা
ঘ. উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা

৪. মসজিদুল আকসা কোথায় অবস্থিত ?

ক. মক্কায় খ. মদিনায়

গ. হোদায়বিয়ায় ঘ. ফিলিস্তিনে

৫. বিবাহের সময় নারীকে মোহর প্রদান করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৬. মুসলিম নারীর পর্দা করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মোবাহ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. حجاب অর্থ কী ? حجاب সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

২. পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে লেখ।

৩. ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।

৪. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার সুফল বর্ণনা কর।

৫. মসজিদের আদব সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

৬. কথা বলার আদব কী? লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ

প্রথম পাঠ

আত্মম্ভরিতা (اَلْعُجُبْ)

আত্মম্ভরিতা (اَلْعُجُبُ) একটি অপছন্দনীয় স্বভাব। পরিভাষায় এটি হলো–

اَلْعُجُبُ عَقْدُ النَّفْسِ عَلَى فَضِيْلَةٍ لَهَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَجَبَ مِنْهَا وَ لَيْسَتْ هِيَ لَهَا

অর্থ : ওজব বা আত্মম্ভরিতা বলতে নিজ সত্তাকে এমন মর্যাদাবান বলে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা, যে মর্যাদা পাওয়ার পর্যায়ে সে নেই। (নুদরা -১১/৫৩৫৬)

শারীরিক শক্তি, অর্থ-সামর্থ, ক্ষমতার দাপট, জনবলের আধিক্যের কারণে মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে অহংকার প্রদর্শন করে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে তখনই নিজের দেহ ও মনে অন্যদের চেয়ে নিজে বড়ো এ রোগের সৃষ্টি হয়। যা তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকায় জনবলের আধিক্যের দিকে খেয়াল করে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তিময় মানসিকতার প্রকাশ ঘটানোর ফলে চরম মার খেতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন–

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

অর্থ : যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য ; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (সুরা তাওবা, ২৫)

অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্তির পথ হলো আল্লাহকে বেশি বেশি সাজদা করা। নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করে অন্যকে ভালো মনে করা, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণে রাখা।

প্রিয় নবি (ﷺ) গর্ব অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোআ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِ

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে অহংকারের আবহ হতে পানা চাই।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রতারণা (اَلْغِشُّ)

প্রতারণা (اَلْغِشُّ) মানব চরিত্রের একটি মারাত্মক রোগ। اَلْغِشُّ বলতে বোঝায়–

مَا يُخْلَطُ مِنَ الرَّدِيِّ بِالْجَيِّدِ

অর্থ : প্রতারনা হলো– ভালোর সাথে খারাপের মিশ্রণ করা। (আত তাওফিক, ২৫২ ও নুদরা, ৫০৬৯)

اَلْغَشُّ سَوَادُ الْقَلْبِ وَ عُبُوْسُ الْوَجْهِ

অর্থ : অন্তরের কালিমা ও মুখ মলিন করা। (কুল্লিয়াত, ৬৭২ ও নুদরা, ৫০৭০)

প্রতারণা বা অন্যকে ঠকানো কবিরা গুনাহ তথা হারাম কাজ।যাদের সর্বনাশের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করে ইরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

অর্থ : দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

(সুরা মুতাফ্‌ফিফিন, ১-৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়। (সহিহ মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَ هُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

অর্থ : যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন, প্রতারক অবস্থায় তার মৃত্যু হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

তাহলে খুব সহজেই বোঝা যায়, প্রতারণা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। আমাদের সকলের উচিত কথায়, কাজে, আচরণে, লেনদেনে প্রতারণা পরিহার করা। দুধে পানি মেশানো, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, দু'রকম কথা বলে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে যেমন অপরাধ তেমন সামাজিকভাবেও এগুলো জঘন্য অপরাধ।

তৃতীয় পাঠ

অপব্যয়-অপচয় (اَلْإِسْرَافُ وَالتَّبْذِيْرُ)

অপব্যয়-অপচয় (اَلْإِسْرَافُ) এমন একটি বদ স্বভাব,যার অপকারিতা ব্যক্তি ও সমাজকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। ইমাম রাগেব বলেন–

تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي كُلِّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ

অর্থ : মানুষের কর্মে সীমালঙ্ঘনকে اَلْإِسْرَافُ বা অপচয় বলে।

অপব্যয়ী ও অপচয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে–

وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ : অপব্যয় করো না, নিশ্চিত যে আল্লাহ অপব্যয়-অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(সুরা আনআম, ১৪১)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন–

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

অর্থ :অপব্যয়ী-অপচয়কারীরা জাহান্নামী। (সুরা গাফির, ৩৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيْلَةٍ

অর্থ : আহার কর, দান কর এবং পরিধান কর। তবে অপব্যয় ও অহংকার করো না।

(সুনানু নাসায়ি)

অপব্যয়ীকে আল্লাহ্ তাআলা শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ

অর্থ : নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। (সুরা ইসরা, ২৭)

তাই অপব্যয় ও অপচয় থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। যতটুকু পানি প্রয়োজন এর অতিরিক্ত খরচ করা কবিরা গুনাহ। গ্যাস, বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। একটি সুন্দর সমাজ গড়তে হলে ব্যক্তি ও সমাজকে অপব্যয় ও অপচয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلْعُجْبُ অর্থ কী?

ক. আত্ম-অহংকার খ. আত্মম্ভরিতা
গ. আত্মসাৎ ঘ. আত্ম সংশোধন

২. মানব চরিত্রের মারাত্মক রোগ কী?

ক. اَلْغَشُّ খ. اَلْبُخْلُ
গ. اَلاَكْلُ ঘ. اَلشُّرْبُ

৪. অপচয়কারীকে কুরআনের দৃষ্টিতে কী বলা হয়েছে?

ক. শয়তানের ভাই খ. শয়তানের চাচা
গ. শয়তানের সঙ্গী ঘ. শয়তানের প্রতিবেশি

৫. প্রতারণা ও অপচয় করা কীসের পরিপন্থি?

ক. নৈতিক চরিত্রের খ. সামাজিকতার
গ. সাম্য প্রতিষ্ঠার ঘ. সমাজ গঠনের

৬. "যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়" এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহ তাআলার খ. নবির (সা.)
গ. সাহাবির ঘ. তাবেয়ির

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। العجب অর্থ কী? ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব বর্ণনা কর।

২। الغش বলতে কী বুঝ? কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।

৩। "الإسراف و التبذير" বলতে কী বুঝ? লেখ।

৪। "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" ব্যাখ্যা কর।

২০২৩

তৃতীয় অধ্যায়

হালাল ও হারাম

اَلْـحَلَالُ وَالْـحَرَامُ

প্রথম পাঠ

হালাল ও হারামের পরিচয়

হালাল (اَلْحَلَالُ) অর্থ বৈধ করা, অনুমোদন করা। শরিয়তের পরিভাষায়–

مَا أَبَاحَهُ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ أَيْ كُلُّ شَيْءٍ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ

অর্থ : আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নতে যা বৈধ করা হয়েছে অর্থাৎ : হালাল ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা করলে শাস্তি দেওয়া হয় না। (কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ, ৬৭)

হারাম (اَلْحَرَامُ) অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ। শরিয়তের পরিভাষায়–

هُوَ الْأَمْرُ الَّذِيْ نَهَى الشَّارِعُ عَنْ فِعْلِه نَهْياً جَازِماً بِحَيْثُ يَتَعَرَّضُ مَنْ خَالَفَ النَّهْيَ لِعُقُوْبَةِ اللهِ فِيْ الْآخِرَةِ – وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِعُقُوْبِهِ شَرْعِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا أَيْضاً.

অর্থ : হারাম ঐ কাজকে বলে, যা শরিয়ত প্রবর্তক অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং পার্থিব জগতেও শরিয়তের বিধান মোতাবেক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (দলিলুস সায়িলিন)

আল্লাহ তাআলা হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ

অর্থ : হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সুরা বাকারা, ১৬৮)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

অর্থ : হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয। (মিশকাত, ২৪২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বহুদিনের প্রবাসী ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ কেশধারি এমন এক ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!

مَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَقَدْ غُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

অর্থ : অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত-পালিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দোআ কেমন করে কবুল হবে?

(সহিহ মুসলিম শরিফ ও জামে তিরমিযি)

তাই, হালাল উপার্জন, হালাল পথে ব্যয় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয় পাঠ

হারাম বস্তু ও হারাম আমল

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবিব (ﷺ) কিছু বস্তুকে হারাম করেছেন আর কিছু আমলকেও হারাম করেছেন। যেমন–

১. اَلشِّرْكُ بِاللهِ - আল্লাহর সাথে শিরক করা

২. اَلدَّمُ - রক্ত

৩. لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ - শূকরের গোশত

৪. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণী

৫. أَكْلُ السُّحْتِ - অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু

৬. اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ - এতিমের মাল

৭. قَتْلُ النَّفْسِ - আত্মহত্যা

৮. قَتْلُ الْاِنْسَانِ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ - শরিয়তের বিধান ছাড়াই মানুষ হত্যা

৯. لَحْمُ الْحِمَارِ الْاَهْلِيِّ - পালিত গাধার গোশত

১০. كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ - হিংস্র প্রাণী

১১. اَلْخَمْرُ - মাদকদ্রব্য

১২. مَيَاسِرُ - জুয়া

১৩. اَكْلُ الرِّبَا - সুদ খাওয়া

১৪. شَرْبُ الْخَمْرِ وَ بَيْعُ الْخَمْرِ - মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রয় করা

১৫. بَيْعُ الْمَيْتَةِ - মৃত প্রাণীর লাশ বিক্রি করা

১৬. بَيْعُ الْخِنْزِيْرِ - শূকর কেনা-বেচা করা

১৭. بَيْعُ الْاَصْنَامِ - মূর্তি বেচা-কেনা করা

১৮. اَلْمَيْتَةُ - মৃত প্রাণী

১৯. اَلسِّحْرُ - জাদু করা

২০. اَلتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ - যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাদপদ হওয়া

২১. قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ - সতি সাধ্বী মহিলার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া

২২. ثَمَنُ الْكَلْبِ - কুকুর বিক্রির অর্থ

২৩. حَلْوَانُ الْكَاهِنُ - গণকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ

২৪. اَلسَّرَقَةُ وَ الْقِطَاعُ وَ النَّهْبُ - চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা ছিনতাই করা

২৫. اَلرِّشْوَةُ - ঘুষ খাওয়া

২৬. اَلْاِرْهَابُ সন্ত্রাস

২৭. ওজনে কম দেওয়া

২৮. মালে ভেজাল মেশানো

২৯. কালোবাজারি

৩০. জবর দখল

৩১. পুরুষের জন্য স্বর্ণের অলংকার, আংটি ও চেইন ইত্যাদি ব্যবহার

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. হালাল অর্থ কী ?

ক. বৈধ করা খ. অনুসরণ করা
গ. সুন্দর করা ঘ. সমুন্নত করা

২. পুরুষের জন্য স্বর্ণের অলংকার, আংটি ব্যবহার করা কী?

ক. হারাম খ. হালাল
গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৩. হালাল রুজি সন্ধান করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. মুবাহ

৪. অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা কীসের বিধানের বিপরীত?

ক. বালাগাত খ. মানতিক
গ. কুরআন ও হাদিস ঘ. শরহে জামী

৫. জাদু করা কী?

ক. মাকরুহ খ. মুবাহ
গ. হালাল ঘ. হারাম

৬. নিচের কোনটি হারাম বস্তু ?

ক. সন্ত্রাস খ. জঙ্গীবাদ
গ. জবরদখল ঘ. রক্ত

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। হালাল অর্থ কী ? হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। "হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজের পর একটি ফরজ" ব্যাখ্যা কর।

৩। কুরআন ও হাদিসের আলোকে হারামের পরিচয় দাও।

৪। দশটি হারাম বস্তুর নাম লেখ।

৫। দশটি হারাম আমলের নাম লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ

প্রথম পাঠ

তওবা ও অনুতাপ

তওবা শব্দের অর্থ : اَلرُّجُوْعُ বা ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায়–

اَلرُّجُوْعُ مِنَ الْبُعْدِ عَنِ اللهِ إِلَى الْقُرْبِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

অর্থ : আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে অবস্থানকারী তাঁর নৈকট্য লাভের দিকে ফিরে আসা।

কোনো কোনো মনীষী বলেন, অনুতাপ অনুশোচনা সহকারে গুনাহ বর্জন করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলে।

তওবার শর্ত চারটি। তিনটি আল্লাহর সাথে অন্যায় করার ক্ষেত্রে আর একটি কোনো বান্দার সাথে অন্যায় করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১। اَلإِقْلَاعُ عَنِ الْمَعَاصِىْ - অতীতের সকল অপরাধ নিজের দেহ, মন-মানসিকতা, নিয়ত ও দৃষ্টি থেকে অতীতের সকল অপরাধ মুলোৎপাটন করা।

২। اَلنَّدَمُ عَنْ فِعْلِ الْمَعَاصِىْ - অতীতের অন্যায়-অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা।

৩। اَلْعَزْمُ عَلٰى عَدَمِ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَعَاصِىْ - অপরাধ আর করবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

৪। اَلْبَرْءُ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا - যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তাঁর থেকে দাবিমুক্ত হওয়া।

এ চারটি শর্ত পূর্ণ হলে তাকে তাওবাতুন নসুহা বলা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ৮৮ টি আয়াতে বিভিন্ন আঙ্গিকে তওবার কথা বলেছেন।

আল্লাহর দরবারে খাঁটি ও খালেস তওবা করলেই ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। ইরশাদ হয়েছে–

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ-

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ তাআলার সমীপে খাঁটি-দৃষ্টান্তমূলক তওবা কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। (সুরা তাহরিম, ৮)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) দৈনিক ১০০ বার তওবা করতেন। যদিও তাঁর কোনো গুনাহ ছিল না। আল্লাহ তাঁকে গুনাহ মুক্ত রাখার শোকরিয়া এবং উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তওবা করতেন। তিনি ইরশাদ করেন–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থ : গুনাহ থেকে তওবাকারী এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেন তার গুনাহই ছিল না।

(সুনানু ইবনি মাজা)

হযরত আলি (রা.) বলেন–

عَجَباً لِمَنْ يَهْلِكُ وَ مَعَه النَّجَاةُ، قِيْلَ لَهٗ وَ مَاهِىَ قَالَ التَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ.

অর্থ : আশ্চর্য ! লোকটি ধ্বংস হচ্ছে অথচ তার সাথেই রয়েছে মুক্তির পথ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো নাজাত কী? জবাবে বললেন, তওবা ও ইস্তেগফার। (দলিলুস সায়িলিন, ১৩৪)

তওবা ইস্তেগফার নিম্নরূপ–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

অর্থ : ' আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাই সকল প্রকার গুনাহ হতে এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাচ্ছি। মহান ও মহামহিম আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত আমার ইবাদত করার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোনো ক্ষমতা নেই।

তওবায় গভীর মনোযোগের সাথে চোখের পানি ছেড়ে মনটাকে নরম করে অপরাধী হিসেবে নিজেকে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হবে। নিজে না জানলে কোনো একজন হক্কানি আলেমের কাছে গিয়ে এমনভাবে তওবা শিখতে হবে, যেন বুঝতে পারে তওবা কবুল হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর যিকির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ তাআলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, বছরে একবার যাকাত প্রদান, একমাস সিয়াম সাধনা ও জীবনে একবার হজ করা ফরয করেছেন। এর মধ্যে যাকাত ও হজ ধনীদের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যিকিরকে জীবনের সকল পর্যায়ে, সর্বশ্রেণির জন্য, সর্বসময়ের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন–
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ أَصِيْلاً .

অর্থ: **হে মুমিনগণ!** তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবিহ পড়ো (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর)। (সুরা আহযাব, ৪২)।

এই যিকির এককভাবেও হতে পারে, সম্মিলিতভাবেও করা যায়। একক যিকির হতে হবে বিগলিত অন্তর ও গোপনীয়তার সাথে যেন অন্য কারো কাজ বা ঘুমের অসুবিধা না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ .

অর্থ: স্মরণ করুন আপনার রবকে আপন মনে কাতরভাবে ও ভীত হৃদয়ে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায়। আর আপনি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সুরা আরাফ, ২০৫)

সম্মিলিতভাবে যিকির করার বিধানও দিয়েছেন আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে–

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ.

অর্থ: তোমরা আমার যিকির করো, আমি তোমাদের যিকির বা স্মরণ করবো, আমার শুকরিয়া আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সুরা বাকারা, ১৫৬)।

এক্ষেত্রে যিকিরের আদব রক্ষা করতে হবে। যিকির হতে হবে বিগলিত অন্তরে, আল্লাহ তাআলার মহব্বতপূর্ণ পরিবেশে। কারো ঘুম বা ইবাদতের ক্ষতি হতে পারে এমন স্থানে জোরে যিকির করা যাবে না। রসুলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) যেভাবে যিকির করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই যিকির করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর অলিগণ যিকিরকে সহজতর ও মন মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য যে সব পদ্ধতিতে যিকির করেছেন সে সব পদ্ধতি গ্রহণ করাও উপকারী।

তৃতীয় পাঠ

তাসবিহ

তাসবিহ শব্দের অর্থ, গুণগান করা, মহিমা, প্রশংসা। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠের বিষয়ে ৪৩ স্থানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সবসময় তাসবিহ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যায় তাসবিহ পড়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلا

অর্থ : এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা কর। (সুরা আহযাব, ৪২)

হজরত আবু হোরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, নবি করিম (ﷺ) এর দরবারে হজরত ফাতেমা (رضي الله عنها) এসে তাঁর কাছে একজন খাদেম চাইলেন। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন, আমি কি তোমাকে খাদেমের চাইতে উত্তম-কল্যাণকর কিছুর সংবাদ দেবো? আর তা হলো, প্রতি সালাতের পর এবং শোয়ার সময় ৩৩ বার আল্লাহর তাসবিহ 'সুবহানাল্লাহ' (سُبْحَانَ اللهِ); ৩৩ বার আল্লাহ তাআলার তাহমিদ 'আলহামদু লিল্লাহ' (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) আর ৩৪ বার আল্লাহ তাআলার তাকবির'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পড়ো। এ তাসবিহকে তসবিহে ফাতেমি বলা হয়। প্রত্যেক সালাতের পর এ তাসবিহসমূহ পড়া উত্তম।

চতুর্থ পাঠ

শবে বরাত, শবে কদর ও দুই ইদের রাতে নফল সালাত

শবে বরাত

শবে বরাত শব্দটি ফার্সি (شب برأت) অর্থ : ভাগ্যরজনি । শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত হিসেবে পালিত হয়। এ রাতে গুনাহ মাফ হয়ে অপরাধীরা গুনাহের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, শবে বরাতকে কুরআন মাজিদে لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ বা বরকতময় রাত হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। (সুরা দোখান, ২)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرَ

অর্থ : যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কেয়াম করবে (সালাত-ইবাদত বন্দেগিতে কাটাবে) এবং দিনে সাওম পালন করবে। এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ প্রথম আকাশে অবতরণ করেন (তাঁর বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে)। তাঁর পক্ষ থেকে আহ্বান আসতে থাকে কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। কেউ রোগগ্রস্থ আছ কি? আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি তাকে রিযিক দেবো। কেউ আছ কি? কেউ আছ কি? এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা আসতেই থাকে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ ঘোষণা চলতে থাকে।

(ইবনু মাজা, ১৩৮৮ ও মিছবাহুয যুজাজাহ, ২/১০ ও তারগিব, ২/৭৫)

শবে বরাতের একটি কাজ হল, কবর যিয়ারত করা। কেননা এ রাতে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে যিয়ারত করেছেন। এ রাতে সকল হারাম ও গুনাহের কাজ থেকে তওবা করা কর্তব্য।

শবে কদর

শবে কদর (شب قدر) অর্থ : মর্যাদার রাত। এ মহান রাতে ইবাদতের কারণে এমন লোকেরও মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতোপূর্বে যাদের কোনো মর্যাদা, মরতবা, কদর ছিল না। তাই এ রাতকে শবে কদর বলা হয়। (ফাযায়েলে মাহে রমযান, মুফতী আমিমুল ইহসান রহঃ পৃ. ২৬)

এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা একটি সুরা নাযিল করেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন কদর তথা মর্যাদাবান রাতে নাযিল করেছি। আপনি কি জানেন, কদর রাত কী? কদর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে অবতীর্ণ হয় ফেরেশেতাগণ ও রুহ, প্রতিটি কাজই তাদের প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক সম্পাদিত হয়। শান্তিই শান্তি –তা ফজরের আর্বিভাব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সুরা আল কদর)

এ রাতের মর্যাদা কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে। তাই, এ রাতে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআন বোঝার চেষ্টা করা, বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা উচিত। প্রিয়নবিকে হজরত আয়শা (ﷺ) প্রশ্ন করেন, যদি আমি শবে কদর পেয়ে যাই তাহলে কী পড়ব? দয়ার নবি বললেন, তুমি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ : হে আল্লাহ ! আপনিতো ক্ষমাশীল, ক্ষমা পছন্দ করেন, আমাকেও ক্ষমা করুন।

(জামে তিরমিযি ও মুসনাদু আহমদ)

দুই ইদের রাতে নফল ইবাদত

বছরে পাঁচটি রাত অধিক মর্যাদাবান এবং দোআ কবুলের রাত। এ সকল রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগি করা মুমিনের জন্য পরম সুযোগ। হজরত আয়শা (ﷺ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

يَنْسَخُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبعِ لَيَالٍ نُسْخًا لَيْلَةَ الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ تنسَخُ فِيْهَا الآجَالَ وَالْأَرْزَاق وَيُكْتَبُ فِيْهَا الْحج وَفِي لَيْلَة عَرَفَةَ إِلٰى الْأَذَانِ.

অর্থ : চার রাতে আল্লাহ কল্যাণের দরজা খুলে দেন। তা হলো–

১. ইদুল আযহা বা কুরবানী ইদের রাত।

২. ইদুল ফিতরের রাত।

৩. শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত (শবে বরাত)।

৪. আরাফার রাত (৮ যিলহজ দিবাগত রাত)। (জামেউল কবির, দায়লামি শরিফ)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১। اَلرُّجُوْعُ অর্থ কী?

ক. ফিরে আসা
খ. আগমন করা
গ. আবেদন করা
ঘ. অগ্রিম আগমন করা

২। তওবার শর্ত কতটি?

ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

৩. তওবা কাকে বলে?

ক. আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিকে ফিরে আসা

খ. আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া

গ. আল্লাহর হুকুম মেনে চলা

ঘ. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

৪. শবে বরাত অর্থ কী ?

ক. ভাগ্যরজনি
খ. সুখের রজনি
গ. আনন্দের রজনি
ঘ. দুখের রজনি

৫. কুরআন মাজিদ কোন রাতে নাযিল হয় ?

ক. কদরের খ. মিরাজের

গ. ইদের ঘ. জুমআর

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। তওবা শব্দের অর্থ কী ? তওবার শর্তগুলো লেখ।

২। "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" এর ব্যাখ্যা কর।

৩। আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪। শবে বরাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।

৫। শবে কদরের ফযিলত বর্ণনা কর।

৬। দুই ইদের রাতে নফল ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাসনুন দোআসমূহ

اَلْأَدْعِيَّةُ الْمَسْنُوْنَةُ

প্রথম পাঠ

কুরআন মাজিদের আলোকে দোআর গুরুত্ব

দোআ (اَلدُّعَاءُ) অন্যতম ইবাদত। বান্দা তার মাবুদের মহান দরবারে হাজত পূরণ, জান্নাত লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, ইহ ও পরকালিন শান্তি ও কল্যাণের আশায় কায়মনোবাক্যে কাকুতি মিনতির সাথে যে আবেদন জানায় তা-ই দোআ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। (সুরা গাফির, ৬০)

দোআ ইবাদতের সারনির্যাস। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

অর্থ: দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ। (জামে তিরমিযী)।

দোআ হতে হবে বিগলিত অন্তরে। মন গলিয়ে বিনয়ের সাথে দোআ না করলে তা কবুল হয় না। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

অর্থ: উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির দোআ আল্লাহ কবুল করেন না। (মিশকাত, ১৯৫)

দোআর মাধ্যমে রহমতের দরজা খুলে যায়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ فُتِحَ لَهٗ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

অর্থ: যার জন্য দোআর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে (অর্থ : যাকে দোআর তওফিক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। (মিশকাত, ১১৫)

দোআ হতে হবে আদবের সাথে। যেমন- উত্তম পোশাকে, হালাল রুজি খেয়ে, নিয়ত খালিস করে, দুহাত তুলে দোআ করতে হবে। দোআর শুরুতে হাম্‌দ ও সালাত এবং শেষে দরুদ শরিফ পাঠ করা। দোআ কবুলের সময় দোআ করা। যেমন : শবে কদর, শবে বরাত, আরাফার দিন, মাহে রমযানের

দিন ও রাত, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর দোআ করা। কুরআন মাজিদে ও হাদিস শরিফে অসংখ্য দোআ বর্ণিত হয়েছে। এ সকল দোআকে মাসনুন দোআ বলা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

হাদিস শরিফের আলোকে দোআর আদব ও গুরুত্ব

দোআ কবুল হওয়ার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সময় ও স্থানের বর্ণনা হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে। দোআ কবুলের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় হলো, ফরজ সালাতের পর দোআ করা।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন–

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ وَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

অর্থ: হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! কোন দোআ অধিক শোনা হয় (কবুল হয়)? হুজুর জবাবে বলেন, রাতের শেষ প্রহরের দোআ এবং ফরয সালাতের পরের দোআ। (জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ি)।

হজরত মাআয (رضي الله عنه) কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই বলে নির্দেশ দেন যে, হে মাআয! কোন সময় সালাতের পর এ দোআ বাদ দিবে না। দোআটি হলো–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার যিকির, শোকরিয়া আদায় এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় পাঠ

কয়েকটি মাসনুন দোআ

(ক) সন্তান ও পরিবারের জন্য দোআ

সন্তান ও পরিবারের লোকদের জন্য দোআ নিম্নরূপ–

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ،رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতে সালাত কায়েমকারী বানাও। হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আমার পিতা-মাতা ও সকল ইমানদারকে বিচারের দিন ক্ষমা করে দিও।

(খ) নতুন চাঁদ দেখার দোআ

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ : হে আল্লাহ, এই চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করুন নিরাপত্তা, ইমান, শান্তি, ইসলাম এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তওফিকসহ। হে চাঁদ! তোমার প্রতিপালক ও আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ।

(গ) নতুন কাপড় পরিধানের দোআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوْرِيَ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيٰوتِيْ

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন পোষাক পরালেন, যা দ্বারা আমি আমার সতর আবৃত করি এবং আমার জীবনে যা দ্বারা সৌন্দর্য অবলম্বন করি।

(ঘ) সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার হলো–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ (নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী) নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশে ওয়াদাবদ্ধ। আমি আপনার কাছে পানা চাই আমার কৃত সকল অনিষ্ট হতে। আমাকে যা নেয়ামত দিয়েছেন তা আপনারই দান–একথা স্বীকার করছি। আমার অপরাধ স্বীকার করছি, আমার গুনাহ মাফ করুন। আপনি ছাড়া তো গুনাহ মাফ করার কেউ নেই।

কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা উক্ত ইস্তেগফার পাঠ করলে সকাল হওয়ার পূর্বে যদি সে মারা যায়, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর সকাল বেলা উক্ত ইস্তেগফার পাঠ করলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও জান্নাত ওয়াজেব। (আলআদাবুল মুফরাদ, ১৫৪)

(ঙ) প্রত্যেক সালাতের পর দোআ

ফরয সালাতের পর প্রিয় নবি (ﷺ) এ দোআ পড়তেন–

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর শরিক নেই, রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যাকে দান করেন, তা রোধ করার কেউ নেই। যাকে বারণ করেন, তাকে দেয়ার কেউ নেই। কোনো সম্পদশালীকে আপনার মোকাবেলায় তার সম্পদ কোনো কল্যাণ দিতে পারে না। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

সালাতের পর দোআর পদ্ধতি কি হবে? এ সম্পর্কে হজরত আসওয়াদ আমেরি (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْفَجْرَ سَلَّمَ وَ انْحَرَفَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا.

অর্থ: আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ফজর সালাত আদায় করলাম। হুজুর সালাম ফিরালেন, তার পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসলেন, হাত উঠালেন এবং দোআ করলেন।

(মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা, ১/২৬৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১৭১; আল মুগনী, ৩২৮)

এ হাদিস প্রমাণ করে ফরয সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোআ করা সুন্নত।

(চ) নিজের ও অন্যের কল্যাণে দোআ

কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে অনেক দোআ বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা, ২০১)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে দীনের ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন, যে দীন আমার সবকিছুর রক্ষাকবচ। আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার আখিরাতকে

কল্যাণময় করুন যা আমার প্রত্যাবর্তন স্থল। আমার জীবনকে যাবতীয় কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় করে দিন এবং আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করে আরামদায়ক করে দিন।

(রিয়াদুস সালেহীন, ৫১৫)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১। اَلدُّعَاءُ কার অন্যতম ইবাদত?

ক. মুমিনের খ. সকল মানুষের
গ. কোনো ব্যক্তির ঘ. কোনো সম্প্রদায়ের

২। اَلدُّعَاءُ কবুলের উপযুক্ত সময় কোনটি?

ক. ফরজ সালাতের পর খ. আসরের সালাতের পর
গ. নফল সালাতের পর ঘ. কুরআন তিলাওতের পর

৩. দোআকে ইবাদতের কী বলা হয়?

ক. মগজ খ. দেহ
গ. কলব ঘ. হৃদয়

৪. ফরজ সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা কী?

ক. সুন্নাত খ. মোবাহ
গ. মাকরুহ ঘ. মোস্তাহাব

৫. দোআ কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত কী ?

ক. হালাল রুজি খ. উত্তম পোষাক
গ. হামদ পড়া ঘ. উপরের সবগুলো

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। سيد الاستغفار সকাল ও সন্ধ্যায় পড়লে কী হয়?

২। হাদিসের আলোকে দোআর আদব ও গুরুত্ব লেখ।

৩। ২টি মাসনুন দোআ আরবিতে অর্থসহ লেখ।

৪। কুরআন মাজিদের আলোকে দোআর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম–আকাইদ ও ফিকহ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম অর্জন ফরজ।
–আল হাদিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।